ইউনিট ১
বীজ

ইউনিট ১ বীজ

ফসল উৎপাদনে বীজ একটি মৌলিক উপকরণ। কারণ বীজ কেবল ফলন বৃদ্ধিই নয় ফসলের মান উন্নয়ন, কীট-পতঙ্গ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থায় জন্মানোর উপযোগীতা নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও এখানে প্রধান খাদ্যশস্য যেমন ঃ ধান, গম, গোল আলু, মিষ্টি আলু, তৈল ও ডাল বীজের হেক্টর প্রতি ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর অন্যতম কারণ হলো ভালো বীজের অপ্রতুলতা এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব। হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং চাহিদা মোতাবেক উৎপাদন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভালো বীজ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। আর ভালো বীজ ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই উন্নত বীজ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কমবেশি ৭০টি ফসলের চাষ হচ্ছে এবং এসব ফসল চাষ করার জন্য বছরে প্রায় ৭ লক্ষ টন বীজের প্রয়োজন হয় যার মূল্য প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। ৭০টি ফসলের মধ্যে কেবল ধান, গম, পাট, আলু, কিছু সবজি, ডাল ও তৈলবীজ সরকারী ব্যবস্থাপনায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। দেশের বর্তমান চাহিদার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বীজের চাহিদা কৃষক নিজেই পূরণ করে থাকে। যার অধিকাংশ নির্ধারিত মানসম্পন্ন নয় কিন্তু উন্নত দেশে শতকরা ১০০ ভাগ ভালো বীজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপণনের যে অবকাঠামো বিদ্যমান তা দিয়ে এর বেশি চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকারীভাবে বীজ উৎপাদনেও খরচ বেশি হয়। অনেক কৃষক বেশি মূল্যে ভালো বীজ ক্রয় করতে চায় না। তারা নিজেদের ফসলের একাংশ বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বীজ নিম্নমানের এবং কম উৎপাদনশীল হয়ে থাকে। বীজ প্রযুক্তি সম্পর্কেও বাংলাদেশের কৃষক খুব একটা অবহিত নন। তাই উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশের গড় ফলন অনেক কম। উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করে চীন ও জাপানে যেখানে ধানের ফলন হেক্টরপ্রতি ৫—৬ টন সেখানে আমাদের দেশে মাত্র ২ টন। সার, পানি এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। একমাত্র বীজ প্রযুক্তি ছাড়া এটা কাটিয়ে ওঠা যাবে না।

তাই ভালো বীজ এবং বীজ প্রযুক্তি অর্থাৎ ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য, বীজ ফসল উৎপাদনের কলাকৌশল, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

পাঠ ১.১ বীজের সংজ্ঞা, প্রকৃত ও কৃষি বীজের মধ্যে পার্থক্য এবং বীজের গুরুত্ব।

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীজের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- প্রকৃত বীজ ও কৃষি বীজের তুলনা করতে পারবেন।
- বীজের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

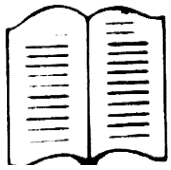

বীজ কাকে বলে বা বীজের সংজ্ঞা কী তা আপনার জানা দরকার। বীজ উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী এবং কৃষি কাজের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার অনুসারে বীজের সংজ্ঞা দু'রকম হতে পারে। প্রথমত, উদ্ভিদতত্ত্বানুসারে ফুলের পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত হবার পর পরিপক্ক ডিম্বককে বীজ বলে। যেমন ঃ ধান, গম, পেঁপে বীজ।

উদ্ভিদতত্ত্বানুসারে ফুলের পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত হবার পর পরিপক্ক ডিম্বককে বীজ বলে। যেমনঃ ধান, গম, পেঁপে বীজ।

দ্বিতীয়ত, কৃষিতত্ত্বানুসারে গাছের যে অংশ (শারীরিক বা জাননিক) বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকেই বীজ বলে। যেমন ঃ আলুর টিউবার, মিষ্টি আলুর লতা, কলার সাকার, কুলের কুঁড়ি, পাথরকুচির পাতা, বিভিন্ন ফুল গাছের শাখা-প্রশাখা, ধান, গম ইত্যাদি।

কৃষিতত্ত্বানুসারে গাছের যে অংশ (শারীরিক বা জাননিক) বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকেই বীজ বলে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রকৃত বীজ ও কৃষি বীজের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি। প্রকৃত বীজ বা যৌন বীজ হচ্ছে বীজত্বকদ্বারা আবৃত এক সুপ্ত ভ্রূণধারী পরিণত ও নিষিক্ত ডিম্বক। আর গাছের যে কোন অংশ বিশেষ, যা উপযুক্ত পরিবেশে একই রকম গাছের বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, তাকে কৃষি বীজ বলে।

গাছের যে কোন অংশ, যা উপযুক্ত পরিবেশে সে গাছের সমতুল্য গাছ উৎপন্ন করতে পারে, তা কৃষি বীজ।

প্রকৃত বীজ ও কৃষি বীজের পার্থক্য

প্রকৃত বীজ	কৃষি বীজ
ক) প্রকৃত বীজ বা যৌন বীজ হলো নিষিক্ত পরিপক্ক ডিম্বক।	ক) গাছের যে কোন অংশ, যা উপযুক্ত পরিবেশে সে গাছের সমতুল্য গাছ উৎপন্ন করতে পারে, তা কৃষি বীজ।
খ) প্রকৃত বীজ বীজত্বক, সস্য ও ভ্রূণ দ্বারা গঠিত।	খ) অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তারকারী কৃষি বীজ বিভিন্ন কোষ কলা (Cell tissue) দ্বারা গঠিত।
গ) যে সব গাছ সাধারণত গাছের অংশ বিশেষ দ্বারা বংশ বিস্তার করা যায় না, সে সব গাছের বংশ বিস্তারের একমাত্র উপায় হলো প্রকৃত বীজ। যেমন ঃ ধান, গম, সরিষা, তাল, নারিকেল ইত্যাদি।	গ) কতিপয় গাছ যেমন ঃ কলা, আনারস, মিষ্টি আলু প্রভৃতি প্রকৃত বীজ উৎপাদন করতে পারেনা। তাই এসব গাছের বংশ টিকিয়ে রাখার জন্য অঙ্গজ কৃষি বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয়।
ঘ) প্রকৃত বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা ও এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবহন সহজ ও সুবিধাজনক।	ঘ) কৃষি বীজের ক্ষেত্রে পরিবহনের কাজটি অসুবিধাজনক ও জটিল।
ঙ) সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রকৃত বীজ একমাত্র উপায়।	ঙ) অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তারকারী কৃষি বীজ দ্বারা সংকরায়ন সম্ভব নয়।
চ) প্রকৃত বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ সাধারণত অধিক কষ্ট সহিষ্ণু হয় ও বেশিদিন বাঁচে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঃ ঝড়, বৃষ্টি, খরা বা যে কোন প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।	চ) অঙ্গজ উপায়ে বংশ বৃদ্ধিকারী গাছসমূহ সাধারণত কম কষ্ট সহিষ্ণু।
ছ) অপেক্ষাকৃত সহজ, সস্তায় ও কম পরিশ্রমে প্রকৃত বীজ দ্বারা চারা উৎপাদন করা যায়।	ছ) এ পদ্ধতিতে প্রায়শ কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ অঙ্গজ কৃষি বীজ দ্বারা বংশবিস্তারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে (কলম, বাডিং, কাটিং) যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়।
জ) প্রকৃত বীজ থেকে উৎপন্ন বিশেষ করে ফল গাছের মাতৃ-গুণাগুণ ঠিক থাকে না।	জ) অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তারকারী কৃষি বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে মাতৃ-গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

আলুর টিউবার বলতে আমরা যে আলু খাই তাকে বোঝায়। কলার সাকার বলতে কলার চারা বোঝায় যা মুথা বা তেউড় নামেও পরিচিত। আনারসের চারাকেও সাকার বলে। কচুর চারাকে কন্দ বা গুঁড়িকন্দ বলে।

বীজের গুরুত্ব

বীজ থেকে গাছ জন্মায় যা পৃথিবীকে ধূসর বিবর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হতে না দিয়ে আচ্ছাদিত করে সবুজ বৃক্ষরাজিতে এবং পরিবেশকে বাসপোযোগী করে। বীজ মানুষের জন্য একটি সর্বোত্তম কল্যাণকর শক্তি। অতি ক্ষুদ্র একটি বীজ মাটিতে বপন করার পর তা সুন্দর, সতেজ ও বৃহৎ একটি গাছে রূপান্তরিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি শক্তি। মানুষ যখন আবিষ্কার করল বীজ থেকে গাছ জন্মায়, মানব সভ্যতার উন্মেষ তখন থেকেই শুরু।

কৃষিতে বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বীজ কেবল ফসলের ফলন বৃদ্ধিই করে না, এর মান উন্নয়ন, কীট ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধ, ভালো বাজার প্রাপ্তি এবং নির্দিষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থায়

জন্মানোর উপযোগিতা ইত্যাদি গুণাগুণও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ফসল উৎপাদনে বীজকে একটি মৌলিক উপকরণ বলা যেতে পারে। অতএব কৃষি কাজে সম্পৃক্ত সকলেরই বীজের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বীজের গুরুত্ব তুলে ধরে।

১। বীজ ফসল উৎপাদনের প্রধান মৌলিক উপকরণ।

২। উন্নত মানের বীজে উচ্চ ফলন হয়।

৩। ভালো বীজ পোকামাকড় ও গাছের রোগবালাই প্রতিরোধ করে।

৪। ভালো বীজ পরোক্ষভাবে উৎপাদন ব্যয় কমায়।

৬। বীজের মাধ্যমে সংকরায়ন (Hybridization) করে উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবন করা হয়।

৭। বীজ ব্যবসা খুবই লাভজনক।

৮। বীজের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

৯। বীজ প্রজাতি টিকিয়ে রাখার অন্যতম পন্থা।

১০। বীজের খামার বা বীজ বর্ধন খামার করে জীবিকা নির্বাহ করা খুবই লাভজনক।

১১। বীজের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়।

আসুন এসব বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

বীজ ফসল উৎপাদনের প্রধান মৌলিক উপকরণ

ফসল উৎপাদনের জন্য অন্যান্য কৃষি উপকরণ, যেমন ঃ সার, সেচ, ও বালাইনাশকের ন্যায় বীজ একটি অন্যতম মৌল উপকরণ। কারণ বীজ বপন না করে অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করলে কোন ফসল আসবে না। কিন্তু বীজ বপন করে অন্যান্য যত্ন না নিলেও কিছু ফলন পাওয়া সম্ভব। অতএব উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা পূর্বক বীজকেই প্রধান মৌলিক উপকরণ বলা যায়।

উচ্চ ফলনশীল বীজে অধিক ফলন হয়

যেখানে জমি সীমিত এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করা উচিত। বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করে সেক্ষেত্রে কিছুটা সফলতা পাওয়া গিয়েছে। পূর্বে দেশী ধান জাতের (যেমন ঃ ধারিয়াল, দুলার, কটকতারা ইত্যাদি) হেক্টর প্রতি ফলন ছিল ১.০—১.৫ টন বর্তমানে উফশী বীজ ব্যবহার করে (ব্রি-ধান ৩০, ৩১, ৩২ ইত্যাদি) হেক্টর প্রতি ৪—৬ টন ফলন পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া দেশী আলুর উৎপাদন যেখানে হেক্টর প্রতি ছিল ৮—১০ টন সেখানে আধুনিক জাত (ডায়মন্ড, পেট্রোনিজ, মূলটা প্রভৃতি) ব্যবহার করে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ২৫—৩০ টন।

ভালো বীজ রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধী

অনেক রোগের জীবাণু বীজবাহিত। তাছাড়া, বীজের স্তূপে পোকা, রোগজীবাণু ও আগাছার বীজে মিশ্রিত থাকতে পারে। বর্তমানে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এগুলো দূর করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্রত্যায়িত ভালো বীজ কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা যাচ্ছে।

ভালো বীজ উৎপাদন ব্যয় কমায়

কম খরচ করে অধিক ফলন পাওয়া কৃষকের একটি অন্যতম লক্ষ্য থাকে। রোগজীবাণু, পোকামাকড় ও আগাছা মুক্ত ভালো বীজ ব্যবহার করে কৃষক সে লক্ষ্যটি অর্জন করতে পারে। সেক্ষেত্রে কীটনাশক, বালাইনাশক এবং আগাছা দমনের জন্য শ্রমিক ব্যয় কমে আসবে।

কম খরচ করে অধিক ফলন পাওয়া কৃষকের একটি অন্যতম লক্ষ্য থাকে। রোগজীবাণু, পোকামাকড় ও আগাছা মুক্ত ভালো বীজ ব্যবহার করে কৃষক সে লক্ষ্যটি অর্জন করতে পারে।

বীজ উন্নত জাত উদ্ভাবনের মাধ্যম

বিজ্ঞানের একটি অন্যতম অবদান হলো উদ্ভিদের বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংকরায়নের মাধ্যমে একটি জাতে সংযোগ করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটি যে সমস্ত ফসল উদ্ভিদতাত্ত্বিক

বীজ উৎপন্ন করে কেবল সেক্ষেত্রে সম্ভব। যেমন ঃ বি আর-৩ ধান দুইটি জাতের ধানের বীজের সাথে সংকরায়ন পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বীজ ব্যবসার উপাদান

বর্তমানে বীজ ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন বীজের ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছে এমন নজিরও এদেশে আছে। বিশেষ করে তরমুজ, বাঁধাকপি, ফুলকপি ও আলু বীজের ব্যবসা খুবই লাভজনক।

বীজের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব

উন্নত জাতের বীজ ও হাইব্রীড বীজ উৎপাদন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাজার তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। বীজ রপ্তানি করে জাপান, তাইওয়ান, ডেনমার্ক, হল্যান্ড উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বীজ প্রজাতি টিকিয়ে রাখার অন্যতম পন্থা

গাছ থেকে যে বীজ উৎপন্ন হয়, সেই বীজ অনুরূপ গাছ উৎপাদনে সক্ষম। সুতরাং যুগ যুগ ধরে বীজ তার প্রজাতি টিকিয়ে রাখছে।

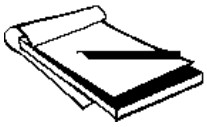

অনুশীলন (Activity) ঃ *বীজ কাকে বলে? বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান ফসলের বীজের মধ্যে কোনগুলো প্রকৃত বীজ তা নির্দেশ করুন। ফসল উৎপাদনে বীজের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। প্রকৃত বীজ কাকে বলে?
- ক) নিষিক্ত ডিম্বককে
- খ) নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে
- গ) বীজত্বক দ্বারা আবৃত ভ্রূণকে
- ঘ) স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের রেণুর মিলনের ফলে উদ্ভাবিত ডিম্বককে

২। কৃষি বীজ কোনটি?
- ক) ফলের ভিতরে বীজ
- খ) গাছের যে কোন অংশ
- গ) গাছের যে কোন অংশ যা তার সমতুল্য একটি গাছ উৎপন্ন করে
- ঘ) গাছের শিকড়

৩। প্রকৃত বীজ দ্বারা উৎপাদিত ফসলে কোনটি সত্য?
- ক) মাতৃ গুণাগুণ ক্ষুন্ন হয়।
- খ) মাতৃ গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।
- গ) মাঝে মাঝে মাতৃগুণ সম্পন্ন হয়।
- ঘ) মাতৃগুণ সম্পন্ন হয় না।

পাঠ ১.২ বীজের শ্রেণীবিভাগ ও বীজের অপরিহার্য্যঅঙ্গসমূহ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীজের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- বীজের অপরিহার্য অঙ্গসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

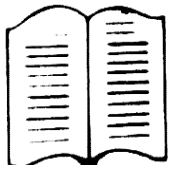

বীজের শ্রেণীকরণ বিভিন্নভাবে করা যায়। বীজের আকার-আকৃতি, ব্যবহার, শারীরবৃত্তীয় গুণাবলী ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বীজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলোঃ

ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস

১। **প্রকৃত বীজ বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ (Botanical seed) ঃ** নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বলে। যেমন ঃ দানাদার বীজ (ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি), তৈলবীজ (সরিষা, সয়াবীন, তিল প্রভৃতি) ও ডালবীজ (মসুর, খেসারী, মুগ প্রভৃতি)।

২। **কৃষি বীজ (Agricultural seed) ঃ** উদ্ভিদের যে কোন অংশ যা অনুকূল পরিবেশ তার সমতুল্য নতুন গাছের জন্ম দিতে সক্ষম তাকে কৃষি বীজ বলে। যেমনঃ কান্ড (আখ, আলু প্রভৃতি), শিকড় (মিষ্টি আলু, কাকরোল, পটল প্রভৃতি) পাতা (পাথরকুচি) থেকে শুরু ধান, গম, ভূট্টা প্রভৃতির বীজ কৃষিজ বীজের উদাহরণ।

নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বলে। যেমন ঃ দানাদার বীজ (ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি), তৈলবীজ (সরিষা, সয়াবীন, তিল প্রভৃতি) ও ডালবীজ (মসুর, খেসারী, মুগ প্রভৃতি)।

উদ্ভিদের যে কোন অংশ যা অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত স্থানে তার সমতুল্য নতুন গাছের জন্ম দিতে সক্ষম তাকে কৃষি বীজ বলে। যেমনঃ কান্ড (আখ, আলু প্রভৃতি), শিকড় (মিষ্টি আলু, কাকরল, পটল প্রভৃতি) পাতা (পাথরকুচি) ধান, গম, ভূট্টা প্রভৃতি।

বীজের আবরণের উপর ভিত্তি করে

১। **নগ্নবীজ ঃ** যে বীজে কোন আবরণ থাকেনা, তাকে নগ্নবীজ বলে। যেমন ঃ গম, ভুট্টা প্রভৃতি।

২। **আবরিত বীজ ঃ** যে বীজে আবরণ থাকে তাকে আবরিত বীজ বলে। যেমন ঃ ধান, ডাল, তৈল বীজ ইত্যাদি।

চিত্র ১ ঃ ধান (ফল ও বীজ)

বীজ পত্রের (Cotyledon) সংখ্যা অনুযায়ী

১। **একবীজপত্রী বীজ (Monocotyledonous seed) ঃ** যে সকল বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে তাদেরকে একবীজপত্রী বীজ বলে। যেমন ঃ ধান, গম, ভুট্টা, নারিকেল, তাল ইত্যাদি।

২। **দ্বিবীজপত্রী বীজ (Dicotyledonous seed) ঃ** যে সকল বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাদেরকে দ্বিবীজপত্রী বীজ বলে। যেমন ঃ পাট, ছোলা, সয়াবীন, আম, কাঠাল ইত্যাদি।

৩। **বহুবীজপত্রী বীজ (Polycotyledonous seed) ঃ** যে বীজে দুই এর অধিক বীজপত্র থাকে তাকে বহুবীজপত্রী বীজ বলে। যেমন ঃ পাইন বীজ।

বীজে ভ্রূণের সংখ্যা অনুসারে

১। **একভ্রূণী বীজ (Monoembryonic seed) ঃ** যে বীজে একটি মাত্র ভ্রূণ থাকে তাকে এক ভ্রূণী বীজ বলে যেমন ঃ পাট, ধান, গম।

২। **বহুভ্রূণী বীজ (Polyembryonic seed) ঃ** যে বীজে একাধিক ভ্রূণ থাকে এবং প্রত্যেকটি ভ্রূণ এক একটি স্বতন্ত্র উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে তাকে বহুভ্রূণী বীজ বলে। যেমন ঃ আম, লেবু ইত্যাদি।

সস্য (Endosperm) এর উপর ভিত্তি করে

১। **সস্যল বীজ (Endospermic seed) ঃ** যে সকল বীজের বীজপত্রের বাইরে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্য হিসেবে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম সন্ধিত থাকে তাদেরকে সস্যল বীজ বলে। যেমন ঃ ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি।

যে সকল বীজে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সস্য হিসেবে জমা না থেকে বীজ পত্রের মধ্যে সন্ধিত থাকে সে সকল বীজকে অসস্যল বীজ বলে। যেমন ঃ কুমড়া, ছোলা ইত্যাদি।

২। **অসস্যল বীজ (Non endospermic seed) ঃ** যে সকল বীজে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সস্য হিসেবে জমা না থেকে বীজ পত্রের মধ্যে সন্ধিত থাকে সে সকল বীজকে অসস্যল বীজ বলে। যেমনঃ কুমড়া, ছোলা ইত্যাদি।

নিষিক্ততা (Fertilization) অনুসারে

১। **নিষিক্ত বীজ (Fertilized seed) ঃ** ডিম্বক পরাগরেণু দ্বারা নিষিক্ত হয়ে যে বীজ উৎপন্ন করে তাকে নিষিক্ত বীজ বলে। যেমন ঃ ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি।

পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত না হয়েই যে বীজ উৎপন্ন হয় তাকে অনিষিক্ত বীজ বলে। এক্ষেত্রে ডিম্বকের দেহ কোষ থেকে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। এই বীজকে এপোমিকটিক বীজ বলে বীজ উৎপন্ন হওয়ার উক্ত পদ্ধতিকে এপোমিক্সিস বলে।

২। **অনিষিক্ত বীজ (Unfertilized seed) ঃ** পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত না হয়েই যে বীজ উৎপন্ন হয় তাকে অনিষিক্ত বীজ বলে। এক্ষেত্রে ডিম্বকের দেহ কোষ (Vegetative cell) থেকে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। এই বীজকে এপোমিকটিক (Apomictic) বীজ বলে এবং বীজ উৎপন্ন হওয়ার উক্ত পদ্ধতিকে এপোমিক্সিস (Apomixis) বলে। এপোমিকটিক বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করলে তাকে অংঙ্গজ বংশ বৃদ্ধি বলে এবং তাতে মাতৃগুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। লেবু, জামবুরা, কমলা ইত্যাদি সাইট্রাস ফলে এপোমিকটিক বীজ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন অঙ্গজ বীজের পরিচিতি

রাইজোম (Rhizome) ঃ রাইজোম ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড। আদা, হলুদ ইত্যাদির বংশ বিস্তারের জন্য রাইজোম ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ২ ঃ রাইজোম

স্ফীত কন্দ (Tuber) ঃ স্ফীত কন্দ ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড। নিম্ন কান্ডের শীর্ষে খাদ্য সঞ্চিত হয়ে তা স্ফীত হয়ে কন্দের রূপ ধারণ করে। এতে চোখ (Eye বা bud), শল্কপত্র (Scale leaves) বর্তমান থাকে। গোল আলুর বংশ বিস্তার টিউবারের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

চিত্র ৩ ঃ স্ফীত কন্দ (গোল আলু)

টিউবারকল (Tubercol বা Bulbil) ঃ এ জাতীয় উদ্ভিদে পাতার কক্ষীয় কুঁড়ি রূপান্তরিত হয়ে স্ফীত ও গোলাকার ধারণ করে। এদের টিউবারকল বা বুলবিল বলে। যেমনঃ মেটে আলুর বুলবিল।

চিত্র ৪ ঃ বুলবিল

শল্ক কন্দ (Bulb) ঃ এটা ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং স্কেল (Scale) সমন্বয়ে গঠিত। পিয়াজের অংঙ্গজ বংশ বিস্তার শল্ক কন্দের দ্বারা করা হয়। অনেক সময় শল্কের কক্ষীয় কুঁড়িও আবার ক্ষুদ্রাকার কন্দে পরিণত হয়। এগুলো কোয়া (Bulblet) নামে পরিচিত। যেমনঃ রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

চিত্র ৫ ঃ শল্ক কন্দ (পেঁয়াজ)

গুঁড়িকন্দ (Corm) ঃ কান্ডের নিচের অংশ স্ফীত ও গোলাকার হলে একে গুঁড়িকন্দ বলে। এতে সন্ধি (Node) ও পর্বসন্ধি (Inter node) বিদ্যমান থাকে। গুঁড়িকন্দের উপরিভাগ শল্কপত্র দ্বারা আবৃত থাকে। আবার গুঁড়িকন্দের নিচের দিকে কতিপয় কুড়ি ক্ষুদ্রাকার গুঁড়িকন্দে পরিণত হয়। এগুলো মুখি নামে পরিচিত। কচুর বংশ বিস্তার গুঁড়িকন্দ দ্বারা করা হয়।

চিত্র ৬ ঃ গুঁড়িকন্দ (ওল কচু)

কন্দালমূল (Tuberous root) ঃ যখন কোন মূল খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে স্ফীত হয়ে উঠে তখন তাকে কন্দালমূল বলে। মিষ্টি আলু ও বিভিন্ন জাতের আলুর বংশ বিস্তারে কন্দালমূল ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৭ ঃ কন্দালমূল (মিষ্টি আলু)

শোষক (Sucker) ঃ মাতৃগাছের গোড়া থেকে নতুন চারা বের হয় এবং বৃদ্ধির প্রথম পর্যায় মাতৃগাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে যেমন ঃ কলা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি।

চিত্র ৮ ঃ সাকার (চন্দ্র মল্লিকা)

অনেক গাছের মূল নতুন চারা গাছের জন্ম দেয় এবং পরে তা কেটে পৃথক করে রোপণ করলে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। বেল ও পেয়ারা ফলের এরূপ শিকড় ব্যবহার করা হয়।

শিকড় (Root cutting) ঃ অনেক গাছের মূল নতুন চারা গাছের জন্ম দেয় এবং পরে তা কেটে পৃথক করে রোপণ করলে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। বেল ও পেয়ারা ফলের এরূপ শিকড় ব্যবহার করা হয়।

পাতা ঃ পাতা থেকেও চারা উৎপন্ন করা যায়। যেমন ঃ পাথরকুচি। অনেক সময় চায়ের পাতা থেকে চারা উৎপন্ন করা হয়।

শাখা কলম (Stem cutting) ঃ বিভিন্ন প্রকার ফসল, ফল ও ফুল গাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য শাখা কলম ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ আম, মিষ্টি আলু, আংগুর, গোলাপ, গন্ধরাজ, ইত্যাদি।

প্রধানত পাঁচভাবে কলমের চারা তৈরি করা হয়। যথাঃ

১। **কর্তন বা ছেদ কলম ঃ** এক্ষেত্রে সরাসরি কচি ডাল কেটে মাটিতে লাগিয়ে চারা তৈরি করা হয়। যেমন ঃ সজিনা, শিমুল, এলামন্ডা ইত্যাদি।

২। **দাবা কলম ঃ** এক্ষেত্রে গাছের শাখার খানিক মাটিতে চাপা দিয়ে তাতে মূল গাজিয়ে মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা হয়। যেমন ঃ লেবু।

৩। **গুটি কলম ঃ** নির্বাচিত গাছের ডালের ৫ সে.মি. পরিমাণ অংশের ছাল তুলে গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে গুটি তৈরি করে চট দিয়ে আটকে দিতে হয়। বর্ষাকালে সাধারণত লিচু, ডালিম, লেবুতে, এ ধরণের কলম করে চারা তৈরি করা হয়।

৪। **জোড় কলম ঃ** এক্ষেত্রে একই জাতের দুটি গাছের কান্ডকে পরিমিত চেছে একত্রে বেঁধে দিলে ২–৩ মাসের মধ্যে জোড়া লেগে যায়। অতঃপর কাঙ্খিত গাছের মধ্যে অন্যটির নিচের অংশ কেটে আলাদা করে কলমের চারা পাওয়া যায়। আমের ক্ষেত্রে জোড় কলম উত্তম।

৫। **চোখ কলম ঃ** পাতা বা ডালের সংযোগ স্থানের কুঁড়িকে বিশেষ পদ্ধতিতে অন্য উদ্ভিদে স্থানান্তরিত করাকে চোখ কলম বলে। গোলাপ, লেবু, কুল প্রভৃতি উদ্ভিদে এ কলম ব্যবহৃত হয়। কুলের ক্ষেত্রে টক কুল গাছকে চোখ কলমের সাহায্যে মিষ্টি কুলে রূপান্তরিত করা যায়।

অনুশীলন (Activity) ঃ *বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মাঠ ফসল ও উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের বীজের শ্রেণিবিন্যাস করুন।*

এতক্ষণ আপনি প্রকৃত বীজের শ্রেণিবিন্যাস এবং কৃষি বীজের বিভিন্ন অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যম সম্পর্কে ধারণা পেলেন। এখন আমরা আলোচনা করবো আন্তর্জাতিক শস্য উন্নয়ন সমিতি (International Crop Improvement Association, ICIA) বীজকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করছেন। উক্ত সমিতি বিভিন্ন বীজের কৌলিক বিশুদ্ধতা, উৎপাদন ও বিতরণের প্রকৃতির ভিত্তিতে বীজকে প্রধানতঃ ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন (ক-ঘ)। কিন্তু বাংলাদেশ বীজ বিধি ১৯৮০ এর ১৮ ধারা মোতাবেক বীজকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে (ক, খ, ঘ)।

(ক) প্রজনন বীজ (Breeder seed)

(খ) ভিত্তি বীজ (Foundation seed)

(গ) নিবন্ধিত বীজ (Registered seed)

(ঘ) প্রত্যায়িত বীজ (Certified seed)

বাংলাদেশ বীজ বিধিতে নিবন্ধিত ও প্রত্যায়িত বীজকে একই ধরণের বিবেচনা করে নিবন্ধিত বীজকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ এ দুই শ্রেণির বীজই ভিত্তি বীজ থেকে উৎপাদিত হয়।

উদ্ভিদ প্রজনন প্রতিষ্ঠান বা কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা কোন প্রজননবিদের ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন বীজ, যা থেকে ভিত্তি বীজ উৎপন্ন করা হয় তাকে প্রজনন বীজ বলে।

প্রজননবীদের বীজ (Breeder seed) ঃ উদ্ভিদ প্রজনন প্রতিষ্ঠান বা কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা কোন প্রজননবিদের ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন বীজ, যা থেকে ভিত্তি বীজ (Foundation seed) উৎপন্ন করা হয় তাকে প্রজনন বীজ বলে। এ বীজের মধ্যে সর্বাধিক কৌলিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity) থাকে। অনুমোদিত বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো প্রজনন বীজ। প্রজনন বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়।

ভিত্তি বীজ ঃ বীজের পরবর্তী বিস্তার ঘটানোর জন্য কৌলিকভাবে শনাক্তকরণযোগ্য জাতের প্রথমিক উৎসকে ভিত্তি বীজ বলে। ভিত্তি বীজে কৌলিক স্বাতন্ত্র্য (Genetic identity) ও জাতের বিশুদ্ধতা (Varietal purity) বিদ্যমান থাকে। ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। অনুমোদনকারী সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বীজ উৎপাদনের নিয়মনীতি পালন করে ও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কমিটির তত্ত্বাবধানে এ বীজ উৎপাদন করা হয়।

নিবন্ধিত বীজ ঃ অনুমোদিত সরকারী উৎসের ভিত্তি বীজ থেকে নিবন্ধিত উৎপাদনকারী যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরণ করে যে বীজ উৎপন্ন করে তাকে নিবন্ধিত বীজ বলে। ভিত্তি বীজের সকল কৌলিক গুণাবলী ও বিশুদ্ধতা নিবন্ধিত বীজে বিদ্যমান রাখা হয়।

প্রত্যায়িত বীজ ঃ ভিত্তি বীজ হতে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয় যাতে বংশগত ও বাহ্যিক বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানের থাকে। প্রয়োজনবোধে প্রত্যায়িত বীজ হতেও সর্বাধিক তিন ধাপ পর্যন্ত প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা যেতে পারে।

বীজের গুণাবলী সংরক্ষণের জন্য প্রত্যয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নামে একটি সরকারী সংস্থা এই অনুমোদনের কাজটি করে থাকে।

বীজের গুণাবলী সংরক্ষণের জন্য প্রত্যয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নামে একটি সরকারী সংস্থা এই অনুমোদনের কাজটি করে থাকে।

বীজের অপরিহার্য অংগসমূহ ঃ একটি বীজের প্রধানতঃ দুইটি অংশ থাকে। যথাঃ

(১) বীজত্বক (Seed coat) ও

(২) অন্তবীজ বা বীজসার (Kernel)।

(১) **বীজত্বক ঃ** বীজের আবরণকে বীজত্বক বলে। ডিম্বকের ত্বক বীজত্বকে পরিণত হয়। বীজত্বক আবার দুইটি আবরণ দ্বারা গঠিত। বাহিরের অপেক্ষাকৃত পুরু ও শক্ত স্তরটিকে বলে বহিঃত্বক বা টেস্টা (Testa)। ভিতরের পাতলা স্বচ্ছ আবরণকে বলে অন্তঃত্বক বা টেগমেন (Tegmen)। বীজত্বক দুইটি সংযুক্ত থাকতে পারে অথবা একটি হতে অন্যটি পৃথক থাকতে পারে। বীজ যে অংশ দ্বারা ফলের সংগে যুক্ত থাকে সেই সংযোগস্থলকে বলে হাইলাম (Hilum) বীজনাভি বা ডিম্বকনাভি। বীজ ফিউনিকুলাস (Funiculus) নামক বোঁটার সংগে হাইলামের সংগে যুক্ত থাকে। হাইলামের সন্নিকটে বীজত্বকে একটি ছিদ্র থাকে যাকে মাইক্রোপাইল (Micropyle) বা বীজরন্ধ্র বলে। কোন কোন বীজের ত্বকে লম্বালম্বি যে প্রবর্ধন দেখা যায় তাকে র‍্যাফি (Raphe) বলে। র‍্যাফির সাহায্যে বীজ বোঁটার সংগে লেগে থাকে।

বীজত্বক অপসারণের পর বীজের অবশিষ্ট অংশকে বলে অন্তবীজ বা কার্নেল বা বীজসার। কার্নেল শুধু ভ্রূণ দ্বারা গঠিত হতে পারে (যেমন ঃ ছোলা বীজ) অথবা ভ্রূণ ও সস্য দ্বারা গঠিত হতে পারে (যেমন ঃ ধান বীজ)।

(২) **অন্তবীজ বা কার্নেল বা বীজসার ঃ** বীজত্বক অপসারণের পর বীজের অবশিষ্ট অংশকে বলে অন্তবীজ বা কার্নেল বা বীজসার। কার্নেল শুধু ভ্রূণ দ্বারা গঠিত হতে পারে (যেমন ঃ ছোলা বীজ) অথবা ভ্রূণ ও সস্য (Endosperm) দ্বারা গঠিত হতে পারে (যেমন ঃ ধান বীজ)।

অন্তবীজ বা কার্নেল এর বিভিন্ন অংশ

ভ্রূণ (Embryo) ঃ বীজত্বক দ্বারা আবৃত সুপ্ত উদ্ভিদকে ভ্রূণ বলে। কার্নেলের মূল অংশ ভ্রূণ। ভ্রূণের দুইটি অংশ যথাঃ ভ্রূণাক্ষ বা টাইজেলাম (Tigellum) ও বীজপত্র (Cotyledon)। ভ্রূণাক্ষের আবার দুইটি অংশ যেমন ঃ ভ্রূণমূল (Radicle) যা থেকে বীজ গজানোর পর শিকড় হয় এবং ভ্রূণকান্ড/ভ্রূণমুকুল (Plumule) যা থেকে কান্ড উৎপন্ন হয়।

ভ্রূণাক্ষ ঃ যে অক্ষের সংগে বীজপত্র সংযুক্ত থাকে তাকে ভ্রূণাক্ষ বলে। ভ্রূণাক্ষের যে স্থানে বীজপত্র সংযুক্ত থাকে তাকে ভ্রূণপর্ব (Nodal zone) বলে। ভ্রূণাক্ষের উপরের অংশ ভ্রূণমুকুল এবং নিচের অংশ ভ্রূণমূল। ভ্রূণাক্ষের যে অংশ পর্বান্বঞ্চলের উপরে অবস্থিত তাকে এপিকোটাইল (Epicotyle) বা বীজ পত্রাধিকান্ড বলে। অপরপক্ষে ভ্রূণাক্ষের যে অংশ পর্বান্বঞ্চলের নিচে অবস্থিত তাকে বলে হাইপোকোটাইল (Hypocotyle) বা বীজপত্রাবকান্ড। একবীজপত্রী উদ্ভিদে ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল যে আবরণীসমূহ দ্বারা আবৃত থাকে তাদেরকে যথাক্রমে কলিওপটাইল (Coleoptyle) এবং কলিওরাইজা (Coleorrhiza) বলে।

চিত্র ৯ ঃ ধানবীজের অনুদৈর্ঘ্যচ্ছেদ

বীজপত্র (Cotyledon) ঃ দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদে দুইটি বীজপত্র এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদে একটি বীজপত্র থাকে। বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকলে তা পুরু ও রসাল হয়। যেমন ঃ ছোলা বীজ। যে বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে না তা পাতলা ও স্বচ্ছ হয় (যেমন ঃ রেড়ি)। নিম্নে চিত্রে বীজের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১০ ঃ ছোলা বীজের বিভিন্ন অংশ

বীজপত্রের কাজ ঃ

- বীজপত্র নরম ও কোমল ভ্রূণমুকুলকে রক্ষা করে।
- বীজপত্র ভ্রূণের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে।
- বীজপত্র ভ্রূণাক্ষকে খাদ্য সরবরাহ করে।

সস্য যুক্ত বীজকে বলে সস্যাল (Albuminous) বীজ। যে বীজে সস্য থাকে না তাকে বলে অসস্যাল বীজ (Exalbuminous)।

সস্য (Endosperm) ঃ কোন কোন কার্নেলে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম পাওয়া যায়। বীজের এন্ডোস্পার্মে শিশু উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। সকল বীজে সস্য থাকে না। সস্য যুক্ত বীজকে বলে সস্যাল (Albuminous) বীজ। যে বীজে সস্য থাকে না তাকে বলে অসস্যাল বীজ (Exalbuminous)।

পেরিস্পার্ম (Perisperm) ঃ ডিম্বকের নিউসেলাসের অবশিষ্টাংশকে পেরিস্পার্ম বলে। ইহা বর্ধিষ্ণু ভ্রূণে খাদ্য সরবরাহ করে। সকল বীজে পেরিস্পার্ম থাকে না। খুব অল্প সংখ্যক বীজে পেরিস্পার্ম থাকে। যেমন ঃ শাপলা।

ছকে বীজের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো

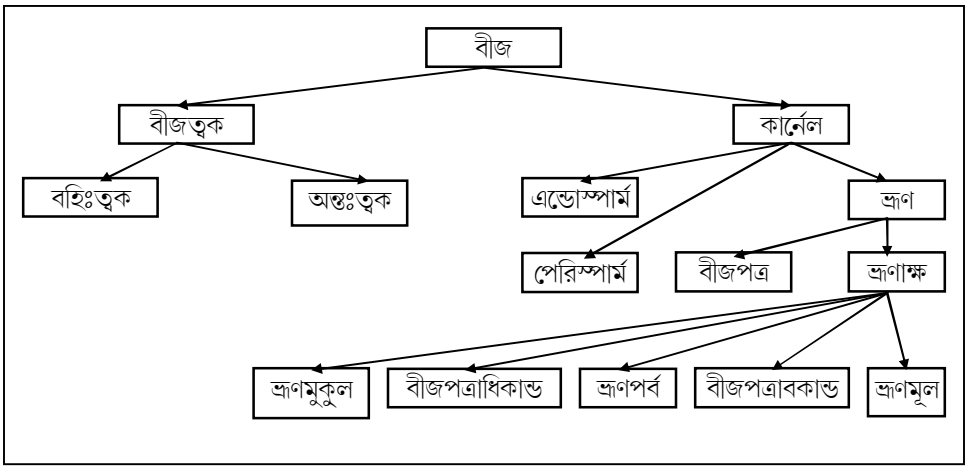

অনুশীলন (Activity) ঃ *একটি আদর্শ বীজের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বাংলাদেশ বীজ বিধি অনুযায়ী বীজের শ্রেণীগুলো কী কী?
- ক) প্রজননবীজ, ভিত্তিবীজ, প্রত্যায়িত বীজ।
- খ) প্রজনন বীজ, ভিত্তিবীজ, নিবন্ধনকৃত বীজ, প্রত্যায়িত বীজ।
- গ) প্রজননবীজ, ভিত্তিবীজ, নিবন্ধনকৃত বীজ।
- ঘ) ভিত্তিবীজ, নিবন্ধনকৃত বীজ, প্রত্যায়িত বীজ।

২। যে বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে তাকে কোন ধরণের বীজ বলে?
- ক) নগ্নবীজ।
- খ) দ্বিবীজপত্রীবীজ।
- গ) একবীজ পত্রীবীজ।
- ঘ) বহুপত্রী বীজ।

৩। আদা হলুদ যা দ্বারা বংশ বিস্তার করে তাকে কী বলে?
- ক) কন্দ।
- খ) রাইজোম।
- গ) গুড়িকন্দ।
- ঘ) শুল্ককন্দ।

৪। ভ্রূণমুকুল থেকে কী উৎপন্ন হয়?
- ক) শিকড় উৎপন্ন হয়।
- খ) কান্ড উৎপন্ন হয়।
- গ) পাতা উৎপন্ন হয়।
- ঘ) বিটপ উৎপন্ন হয়।

পাঠ ১.৩ বীজমান বৈশিষ্ট্যসমূহ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীজের জীবনীশক্তি, অঙ্কুরোদগম ও তেজ বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

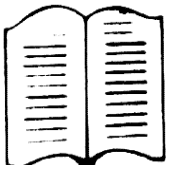

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। ভালো বীজ পরিস্কার হবে। এর মধ্যে ময়লা, ধুলো বালি, আগাছা কিংবা অন্য কোন ফসলের বীজ থাকবে না।

২। বীজের উজ্জল রং থাকতে হবে। বর্ণ ফ্যাকাশে কিংবা ময়লাযুক্ত হওয়া চলবে না। জাতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বীজের স্বাভাবিক বর্ণ থাকতে হবে।

৩। ভালো বীজ সজীব, সুপরিপক্ক, পুষ্ট ও অধিক তেজ (Vigour) সম্পন্ন হবে। বেশিদিন কিংবা অবাঞ্ছিত অবস্থায় সংরক্ষিত বীজ স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন তেজ সম্পন্ন হয়। অধিক তেজ সম্পন্ন বীজ সতেজ ও সবল গাছ উৎপাদন করতে ও উচ্চ ফলন দিতে সক্ষম।

৪। ভালো বীজ অবশ্যই রোগ জীবাণুমুক্ত হবে। রোগমুক্ত বীজ থেকে সবল, সতেজ ও স্বাস্থ্যকর চারা এবং ভালো ফলন পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

ভালো বীজ কৌলিতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশুদ্ধ থাকবে (Genetic purity), অর্থাৎ তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা থাকবে।

৫। ভালো বীজ অবশ্যই পোকামাকড় আক্রমণমুক্ত হবে।

৬। ভালো বীজ কৌলিতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশুদ্ধ থাকবে (Genetic purity), অর্থাৎ তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা থাকবে।

৭। বীজে সমরূপিতা থাকবে।

৮। বীজ অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮০–৯০% হতে হবে।

৯। বীজের আর্দ্রতা ১২% এর নিচে থাকতে হবে।

উপরে বর্ণিত বীজের গুণাবলী থেকে বীজের বৈশিষ্ট্যকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

(১) অংকুরোদগম ক্ষমতা
(২) জীবনীশক্তি
(৩) তুলনামূলক মান বা গুণাগুণ
(৪) কৌলিতাত্ত্বিক বা বংশগত বিশুদ্ধতা

অনুকূল পরিবেশে বীজের ভ্রূণ থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অংগ নির্গমন ও বৃদ্ধি যা পরিণামে একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ইংগিত বহন করে এমন সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিকে বীজের অংকুরোদগম বলে।

অংকুরোদগম ক্ষমতা ঃ আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষণ সমিতির (ISTA) দেয়া সংজ্ঞানুযায়ী অনুকূল পরিবেশে বীজের ভ্রূণ থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অংগ নির্গমন ও বৃদ্ধি যা পরিণামে একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ইংগিত বহন করে এমন সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিকে বীজের অংকুরোদগম বলে।

অংকুরোদগমের জন্য অনুকুল পরিবেশ অর্থাৎ পরিমিত পানি, তাপ, বাতাস বা অক্সিজেন এবং কখনো আলোর প্রয়োজন। সাধারণতঃ বীজ ১৩°–৩৮° সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে গজাতে পারে। তবে এর মাঝামাঝি তাপমাত্রাই হলো বীজ গজানোর জন্য উৎকৃষ্ট বা যথোপযুক্ত। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে গেলে বীজ আর গজাবে না বরং মারা যাবে। কিন্তু তাপমাত্রা সর্বনিম্ন সীমা অতিক্রম করলেও বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকতে পারে।

সর্বনিম্ন	যথোপযুক্ত	সর্বোচ্চ
১৩ ডিগ্রি সেঃ	—	৩৮ ডিগ্রি সেঃ
অংকুরোদগম ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে	স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক অংকুরোদগম যোগ্য	অংকুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে

বীজের তেজ (Seed vigour)

বীজের তেজ হলো বীজের মধ্যে নিহিত অংকুরোদগম ক্ষমতা সংরক্ষণ থাকার ক্ষমতা ও বীজ থেকে গাছ গজাবার পর তাকে শক্ত সমর্থ করে তোলার শক্তির সমন্বয়। উদ্ভিদ জন্মানো এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তির সকল পর্যায়েই বীজের তেজের প্রভাব রয়েছে। কম তেজ সম্পন্ন বীজের ফসল দেরীতে পাকে। ফলে ফলন কম হয় এবং ফসলের সার্বিক মানের অবনতি ঘটে।

বীজের তেজ হলো বীজের মধ্যে নিহিত অংকুরোদগম ক্ষমতা সংরক্ষণ থাকার ক্ষমতা ও বীজ থেকে গাছ গজাবার পর তাকে শক্ত সমর্থ করে তোলার শক্তির সমন্বয়। উদ্ভিদ জন্মানো এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তির সকল পর্যায়েই বীজের তেজের প্রভাব রয়েছে।

পরাগায়নের মাধ্যমে ফুলের মধ্যে যখন বীজের জন্ম হয় তখন থেকেই বীজের তেজ অর্জন শুরু হয়, এবং ফসলের পরিপক্কতা লাভ, ফসল কর্তন, এবং তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণাগারে নেয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে। সংরক্ষণাগারেও বীজের তেজ প্রভাবিত হয়। বীজের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামোও তেজকে প্রভাবিত করে।

বীজের সজীবতা বা প্রানবন্ততা (Viability) এবং জীবনীশক্তি (Vigour) সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে এবং একসময় বীজ মারা যায়। বীজ মানের এ অবনতি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর নির্ভর করে-

- জাতের বংশগত বিশুদ্ধতা
- বীজের পুষ্টতা
- সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা
- গুদামের অবস্থা
- বীজ লটের পরিমাণ
- পোকা মাকড়ের আক্রমণ
- বীজ গুদামের ভিতরের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিত আর্দ্রতা।

উচ্চ তেজ সম্পন্ন বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকার ক্ষমতা রাখে।

উচ্চ তেজসম্পন্ন বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকার ক্ষমতা রাখে।

বীজ মান (Seed quality)

বীজের অপর বৈশিষ্ট্য হলো বীজের নিজস্ব স্বকীয়তা বা নিজস্ব গুণাগুণ বা তুলনামূলক মান। উচ্চমানের বীজ বলতে সে বীজকে বুঝায় যে বীজ বপনের পর সবল, সতেজ এবং একই প্রকারের চারা গজাতে এবং পরবর্তীতে পুর্ণাংগ সবল ফলদায়ক উদ্ভিদে পরিণত করতে সক্ষম।

বীজের মান বলতে বীজের অনেকগুলো গুণের সমষ্টিকে বুঝায়। একক বীজের বেলায় এ গুণগুলো হলো– গজাবার ক্ষমতা, জীবনীশক্তি, পুষ্টতা, যান্ত্রিক ক্ষত, রোগ/বালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণমুক্ততা আকৃতি, বাহ্যিক চেহারা, জীবন পরিধি এবং কার্যকারিতা।

বংশগত বিশুদ্ধতা (Genetic purity)

একটি ফসলের পরিচিতি তার জন্মগত ও বংশগত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জাতের মধ্যে। বিভিন্ন ফসলের মধ্যে বিভিন্ন জাত আছে এবং একই ফসলের বিভিন্ন জাতের মধ্যে বংশগত তারতম্যও বিরাজমান থাকে। যেমন ঃ ধানের বেলায় বি আর ৩, বি আর ১০, বি আর ১১, বি আর ২৬ ইত্যাদি। গমের বেলায় সোনালিকা, কাঞ্চন, আকবর ও বাঁধাকপির বেলায় এটলাস-৭০, কে কে ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বীজ উৎপাদনে জাতের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। তাই একই জাতের বীজের মধ্যে অন্য জাতের মিশ্রণ দূষণীয়। জাতের বিশুদ্ধতা বীজ মানের অন্যতম ভিত্তি এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভালোবীজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছক

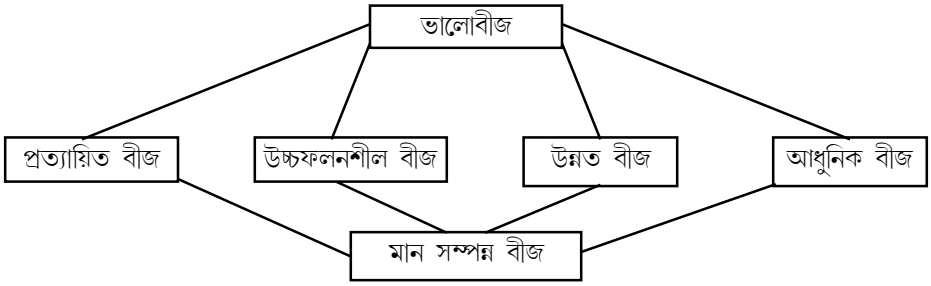

ভালো বীজের ক্ষেত্রে স্মরণীয়

- বীজ হতে হবে উচ্চ ফলনশীল/উন্নত/আধুনিক অথবা কৃষকের পছন্দ সই।
- বীজ হতে হবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ যে জাত চাওয়া হচ্ছে সে জাতের পরিমাণ শতকরা ৯৪ ভাগের বেশি।
- বীজ পোকা কিংবা রোগাক্রান্ত হবে না।
- বীজ এক আকারের ও পুষ্ট হতে হবে এবং দানা বড় হতে হবে।
- বীজের রং উজ্জ্বল হতে হবে অর্থাৎ বীজে স্বাভাবিক রং বজায় থাকতে হবে।
- ধান ও গমের বেলায় বীজের আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ১২% এবং অন্যান্য ফসলের বেলায় সর্বোচ্চ ১০% থাকতে হবে।
- সর্বোপরি বীজ বিশেষে গজানোর ক্ষমতা ৭৫% এর বেশি হতে হবে।

ধান ও গমের বেলায় বীজের আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ১২% এবং অন্যান্য ফসলের বেলায় সর্বোচ্চ ১০% থাকতে হবে।

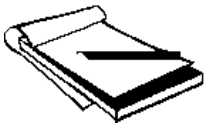

অনুশীলন (Activity) ঃ *ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। আপনি কীভাবে ধানের ভালো বীজ শনাক্ত করবেন?*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ভালো বীজ কী রকম হতে হবে?
- ক) পুষ্ট ও পরিপক্ক।
- খ) রোগ জীবাণুমুক্ত/পোকা মাকড়মুক্ত।
- গ) কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ।
- ঘ) উপরের সবগুলো গুণাগুণসহ।

২। ধান ও গম বীজের সর্বোচ্চ আর্দ্রতা কী পরিমাণ থাকতে হবে?
- ক) ১৪%
- খ) ১২%
- গ) ১৩%
- ঘ) ১১%

৩। সোনালিকা একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। এটি কোন্ ফসলের জাত?
- ক) ধানের
- খ) ভুট্টার
- গ) গমের
- ঘ) আলুর

৪। বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে কত থাকতে হবে?
- ক) ৭০–৭৫%
- খ) ৭৫–৮০%
- গ) ৮০–৯০%
- ঘ) ৬০–৭৫%

পাঠ ১.৪ বীজের সুপ্ততা এবং সুপ্ততার কারণসমূহ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীজের সুপ্ততা কী এবং বিভিন্ন ধরণের সুপ্ততা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীজের সুপ্ততার কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বীজের সুপ্ততা

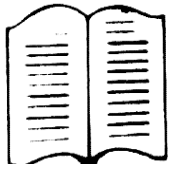

কোন সজীব বীজকে উপযুক্ত পরিবেশে বপন করলে অংকুরোদগম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সকল বীজে এরূপ ঘটেনা। কোন কোন বীজের জীবনকালে সকল বৃদ্ধি প্রক্রিয়া থেমে থাকে, যদিও শ্বসন প্রক্রিয়া অতি ধীর গতিতে চলতে থাকে। বীজের এ অবস্থাকে সুপ্ততা বলে। সুপ্ততার অবসান হলে বীজের অংকুরোদগম হয়। বীজের সুপ্ততা বীজ ভেদে কয়েকদিন থেকে কয়েক বৎসর হতে পারে। বীজের সুপ্তাবস্হাকে নিম্নোপায়ে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

উপযুক্ত পরিবেশে কোন সজীব বীজের অংকুরোদগম না হওয়াকেই বীজের সুপ্তাবস্হা বলে। উক্ত বীজকে সুপ্ত বীজ বলে।

বিভিন্ন কারণে বীজের সুপ্ততা হতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত কারণসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) প্রাথমিক সুপ্ততা
(২) মাধ্যমিক সুপ্ততা
(৩) বিশেষ প্রকার সুপ্ততা

(১) **প্রাথমিক সুপ্ততা ঃ** বীজ মাতৃগাছে পরিপক্ক হওয়া পর্যায়ে বীজের নিজস্ব ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় কারণে অংকুরোদগম হয় না। এ অবস্হাকে প্রাথমিক সুপ্ততা বলে। এর স্হায়ীত্ব নিম্নরূপ হবেঃ

– অস্হায়ী বা স্বল্পস্হায়ী
– দীর্ঘস্হায়ী

অস্থায়ী বা স্বল্পস্হায়ী সুপ্ততা কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে এবং দীর্ঘস্হায়ী সুপ্ততা ৩-৬ মাস হতে পারে।

অস্থায়ী বা স্বল্পস্হায়ী সুপ্ততা কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে এবং দীর্ঘস্হায়ী সুপ্ততা ৩–৬ মাস হতে পারে। বীজের প্রাথমিক সুপ্ততার কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) অভেদ্য বীজত্বক
(খ) দৃঢ় বীজাবরণ
(গ) বীজত্বকের অক্সিজেন অভেদ্যতা
(ঘ) অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ
(ঙ) সুপ্ত ভ্রূণ
(চ) অঙ্কুরোদগম রোধক দ্রব্যের উপস্হিতি

(২) **মাধ্যমিক সুপ্ততা ঃ** বীজ কর্তনের বা সংগ্রহের পরপরই অংকুরোদগমে সক্ষম এমন বীজকে কিছু সময় প্রতিকুল পরিবেশে রাখার দরুণ বীজ সুপ্ততা প্রাপ্তি হলে তাকে মাধ্যমিক সুপ্ততা বলে। এই সুপ্ততাকে কৃত্রিম সুপ্ততা বলা যেতে পারে।

(৩) **বিশেষ প্রকার সুপ্ততা ঃ** যে বীজে সুপ্ততা থাকা সত্ত্বেও অংকুরোদগম হওয়ার পর নানা কারণে অংকুরিত ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাকে বিশেষ সুপ্ততা বলে। অনেক বন্য ফুলে স্বাভাবিক বাহ্যিক পরিবেশে বীজের অংকুরোদগম হওয়ার পরও ভ্রূণমূল প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুণ চারাগাছ উৎপন্ন হয় না তাকে এপিকোটাইল সুপ্ততা বলে। উক্ত এপিকোটাইল সুপ্ততা সম্পন্ন বীজ ১–১০^{o} সেন্টিগ্রেডে কয়েকদিন রাখলে সুপ্ততা দূর হয়।

প্রাথমিক সুপ্ততার কারণসমূহের বিশদ বর্ণনা

নানা কারণে বীজে সুপ্ততা দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশেষ সুপ্ততার কারণের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তবে কৃষিতাত্ত্বিক (Agronomic) বিবেচনায় প্রাথমিক কারণগুলিকেই সুপ্ততার কারণ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

অভেদ্য বীজত্বক

বীজের আবরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত হওয়ার ফলে বীজের ভিতরে পানি ঢুকতে না পারার দরুণ বীজের সুপ্ততা দেখা দেয়। এর সাথে সময়ের বা শারীরবৃত্তীয় পরিপক্কতা লাভের কোন সম্পর্ক নেই। বীজে যতদিন পর্যন্ত পানি প্রবেশের অনুকূল ব্যবস্থা না করা হবে ততদিন উক্ত বীজের ত্বরিৎ অংকুরোদগম হবে না। উদাহরণ স্বরূপ লিগিউম পরিবারের কৃষ্ণচূড়া, ইপিল ইপিল ও জবা পরিবারের তূলা বীজ এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সকল বীজ সংগ্রহের পরপরই বীজত্বক পানি অভেদ্য থাকে। কিন্তু শুষ্ক অবস্থায় সংরক্ষণ করার পর ধীরে ধীরে পানি ভেদ্যতা বাড়তে শুরু করে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কমালে বাড়লে পানি ভেদ্যতা দ্রুত বাড়ে। কৃত্রিমভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষত সৃষ্টি করলে অংকুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। যেমন ঃ ইপিল ইপিল বীজ একটি পিন দ্বারা হালকাভাবে ফুটো করে দিলে সদ্য সংগৃহীত বীজ ৩–৫ দিনের মধ্যে অংকুরিত হয়, অথচ পিন না ফুটালে ১৫ দিনেও অংকুরিত হয় না।

ইপিল ইপিল বীজ একটি পিন দ্বারা হালকাভাবে ফুটো করে দিলে সদ্য সংগৃহীত বীজ ৩-৫ দিনের মধ্যে অংকুরিত হয়, অথচ পিন না ফুটালে ১৫ দিনেও অংকরিত হয় না।

দৃঢ় বীজাবরণ

কিছু কিছু বীজ আছে যাদের আবরণ যথেষ্ট পুরু ও শক্ত থাকে। ফলে পর্যাপ্ত পানি পেলেও ভ্রূণ স্ফীত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন ঃ পিগ আগাছা ও কেপসেলা গণের উদ্ভিদের বীজ।

বীজত্বকের অক্সিজেন অভেদ্যতা

বীজত্বকের অক্সিজেন অভেদ্যতার কারণেও বীজ সুপ্ততা দেখা দিতে পারে। ঘাগরা বীজের ত্বক ফাটিয়ে দিলে বা বীজের চারপাশে অক্সিজেনের চাপ বাড়ালে এদের সুপ্ততা ভংগ হয়। গাছের উপরের দিকের বীজের জন্য অক্সিজেনের চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রয়োজন হয়। শুষ্ক অবস্থায় রেখে দিলে বা সংরক্ষণ করলে এসকল বীজের অক্সিজেন ভেদ্যতা বাড়তে থাকে। কিছু ঘাসবীজ ও কম্পোজিটি পরিবারের বীজে বীজত্বকের অক্সিজেনের অভেদ্যতাজনিত সুপ্ততা দেখা যায়।

অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ

অনেক উদ্ভিদ বীজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভ্রূণের বৃদ্ধির হার সংলগ্ন অন্যান্য অংশের কোষকলা অপেক্ষা কম। এমতাবস্থায় বাহ্যিক দিক থেকে বীজটি পুষ্ট হলেও তার ভ্রূণ ক্ষুদ্রাকার থেকে যায় অথচ বাহির থেকে তা বুঝার কোন উপায় নেই। তাই বীজটি উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করার পর উক্ত ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা পেতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ততদিন উক্ত বীজের সুপ্তাবস্থা থাকবে। বিভিন্ন প্রকার অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদে এ অবস্থা সচরাচর চোখে পড়ে।

সুপ্ত ভ্রূণ

অনেক বীজে পরিপক্ক ভ্রূণ শারীরবৃত্তীয় কারণেও সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। এ ধরণের বীজের আবরণ তুলে ফেলে অংকুরোদগমের উপযুক্ত বাহ্যিক পরিবেশে স্থাপন করলেও অংকুরোদগম হবে না। একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই কেবল এই সমস্ত বীজের অংকুরোদগম সম্ভব। পাইন ও পীচ বীজে এ জাতীয় সুপ্তাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অনেক বীজে পরিপক্ক ভ্রূণ শারীরবৃত্তীয় কারণেও সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে। এ ধরণের বীজের আবরণ তুলে ফেলে অংকুরোদগমের উপযুক্ত বাহ্যিক পরিবেশে স্থাপন করলেও অংকুরোদগম হবে না।

অংকুরোদগম রোধক দ্রব্যের উপস্থিতি

অনেক উদ্ভিদের বীজে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে। উক্ত পদার্থসমূহ অংকুরোদগমে সরাসরি বাধা প্রদান করে। পেঁপে ও বাঁধাকপির বিভিন্ন জাতের বীজে এরূপ রোধকের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে।

মাধ্যমিক সুপ্ততার কারণসমূহ

যদি কোন বীজ অংকুরোদগমের অনুপযুক্ত বাহ্যিক পরিবেশগত কারণে সুপ্ততা প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে মাধ্যমিক সুপ্ততা বলে।

যদি কোন বীজ অংকুরোদগমের অনুপযুক্ত বাহ্যিক পরিবেশগত কারণে সুপ্ততা প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে মাধ্যমিক সুপ্ততা বলে। বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক সুপ্ততা হতে পারে, নিম্নে কারণগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি ঃ যদি বীজকে উক্ত গ্যাসের ভিতরে কিছু সময় ধরে রাখা হয় এবং পরে অংকুরোদগমের উপযুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনা হয় তবে সুপ্ততা প্রদর্শন করে। সাদা সরিষা বীজে এরকমের সুপ্ততাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

আলো ঃ যে সমস্ত বীজের অংকুরোদগমের জন্য আলোর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক, তাদের কিছুদিন অন্ধকার অবস্থায় রাখলে সুপ্ততা প্রদর্শন করে। অপরপক্ষে যে সমস্ত বীজের অংকুরোদগমের জন্য অন্ধকার অত্যাবশ্যক, তাদেরকে আলোতে কিছুদিন রাখলে সুপ্ততা প্রদর্শন করে।

তাপমাত্রা ঃ তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলেও বীজে সুপ্তাবস্থা আসে। যে সমস্ত বীজের অংকুরোদগমের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন তাদের নিম্ন তাপমাত্রায় স্থাপন করলে এবং যে সমস্ত বীজের অংকুরোদগমের জন্য নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন তাদেরকে উচ্চ তাপমাত্রায় স্থাপন করলে সুপ্ততা প্রদর্শন করে।

বীজাবরণের পরিবর্তন ঃ অনেক সময় বীজাবরণের পরিবর্তনের ফলে বীজে সুপ্তাবস্থা আসে। উক্ত বীজের আবরণকে সরিয়ে ফেললে ভ্রূণের অংকুরোদগম হয়। কিন্তু পরিবর্তিত বীজাবরণের উপস্থিতি উক্ত বীজে সুপ্তাবস্থা আনয়ন করে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *বীজের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সুপ্ততার কারণসমূহ তুলনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। অনুকূল পরিবেশে কোন সজীব বীজ অংকুরোদগম না হলে সে বীজকে কী বলে?
- ক) সুপ্তবীজ
- খ) মৃতবীজ
- গ) অবীজ
- ঘ) নগ্নবীজ

২। বীজের সুপ্ততার স্থায়ীত্ব কতদিন হতে পারে?
- ক) কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ
- খ) কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস
- গ) কয়েক মাস থেকে কয়েক বৎসর
- ঘ) কয়েকদিন থেকে কয়েক বৎসর

৩। বীজ মাতৃগাছে পরিপক্ক হওয়া পর্যায়ে বীজের নিজস্ব ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় কারণে অংকুরোদগম হয় না। বীজের এ অবস্থাকে কী বলে?
- ক) প্রাথমিক সুপ্ততা
- খ) মাধ্যমিক সুপ্ততা
- গ) বিশেষ সুপ্ততা
- ঘ) অস্থায়ী সুপ্ততা

৪। অপূর্ণাঙ্গ ভ্রূণের কারণে কোন বীজের সুপ্ততা পরিলক্ষিত হয়?
- ক) ধান বীজে
- খ) পাইন বীজে
- গ) আর্কিড বীজে
- ঘ) পীচ ফলের বীজে

পাঠ ১.৫ বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গার উপায়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সুপ্ততা ভঙ্গের কী কী উপায় আছে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ভৌতিক ও রাসায়নিক উপায়ে কীভাবে সুপ্ততা ভাঙ্গা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বীজতত্ত্ববিদগণ বীজের সুপ্ততা ভঙ্গের নানা উপায় খুজে বের করেছেন। এদের একক বা সম্মিলিত পদ্ধতি বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গতে বা কমিয়ে আনতে সক্ষম। কোন পদ্ধতিই এককভাবে সকল বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গানোর জন্য উপযুক্ত নয়। বীজ এবং সুপ্ততার প্রকৃতি অনুসারে পদ্ধতিরও পার্থক্য হয়। কোন একটা পদ্ধতি হয়ত কোন জাতের বীজের সুপ্ততা তাড়াতাড়ি ভঙ্গ করতে পারে। সেই পদ্ধতি আবার অন্য জাতে তা দীর্ঘায়ু করতে পারে। তাই বীজের সুপ্ততা ভংগের কাজ অবশ্যই যথাযথভাবে করা বাঞ্ছনীয়। বীজের সুপ্ততা ভংগের বিভিন্ন পদ্ধতি নিচে বিশদভাবে বর্ণনা করা হলো-

কোন পদ্ধতিই এককভাবে সকল বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গানোর জন্য উপযুক্ত নয়। বীজ এবং সুপ্ততার প্রকৃতি অনুসারে পদ্ধতিরও পার্থক্য হয়।

(১) **পানিতে ভিজিয়ে রাখা ঃ** এ পদ্ধতিতে বীজকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। ফলে যে সমস্ত বীজে সহজে পানি প্রবেশ করতে পারে না সে সকল বীজে পানি প্রবেশ ত্বরান্বিত হয়, বীজ আবরণ নরম হয়, ভ্রূণের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং বীজ আবরণ সহজে অল্প চাপে ফেটে যায়। পানির পরিমাণ এবং ভিজিয়ে রাখার সময় বীজের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল।

(২) **যান্ত্রিক ও দৈহিক আঁচড়ানো ঃ** আঁচড়ানোর উদ্দেশ্য হলো শক্ত বীজাবরণকে এমনভাবে পরিবর্তন করে নেয়া যাতে করে বীজের ভিতরে সহজেই পানি ও অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে। যান্ত্রিক উপায়ে বীজকে একটি যন্ত্রে নিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করা হয় যাতে বীজের আবরণে কোথাও কোন ফাটল ধরে বা ক্ষয় হয়। দৈহিকভাবেও বীজকে কোন পাথর, ইট, বা এ জাতীয় কোন পদার্থের সাথে ঘর্ষণ বা কোন কিছুর মাঝে রেখে চাপ প্রয়োগ করা হয়। যান্ত্রিক বা দৈহিক আঁচড়ানোর কাজ খুব সাবধানে করতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই বীজের ভ্রূণ নষ্ট না হয়। কী পদ্ধতিতে বা কতক্ষণ আঁচড়াতে হবে তা বীজের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

(৩) **অম্লদ্রব্য সহযোগে আঁচড়ানো ঃ** এ পদ্ধতিতে বীজকে ঘন সালফিউরিক এসিডে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হয়। ঘন সালফিউরিক এসিডের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৮৪ হওয়া দরকার। সাধারণত বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ এসিড (নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার) একটি কাঁচ বা মাটির পাত্রে নিতে হয়। তারপর বীজকে উক্ত পাত্রে ঢেলে মুখ আটকাতে হবে এবং মাঝে মাঝে কোন কাঠির সাহায্যে বীজকে নাড়াচাড়া করতে হবে। অতিরিক্ত নাড়াচাড়া উচিত নয়। তবে বীজের চতুপার্শ্বে যেন সমভাবে এসিডের ক্রিয়া হয় এবং উক্ত মিশ্রণের তাপমাত্রা যেন খুব বেড়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। উপযুক্ত তাপমাত্রা হলো ৬০^{O}–৮০^{O} ফাঃ।

এই পদ্ধতিতে বীজকে কতক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে তা তাপমাত্রা, বীজের প্রকৃতি, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বীজের স্তুপের উপর নির্ভর করবে। সময়ের পরিমাণ ১০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ৬ ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে। বীজাবরণ যখন পাতলা হয়ে আসে তখন সাবধানে এসিড ঢেলে নিতে হয় এবং তৎক্ষনাৎ বীজগুলোকে প্রবাহমান পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়। উক্ত ধোয়া বীজ ভিজা অবস্থায় সরাসরি জমিতে বপন করা চলে। অথবা ভালোভাবে শুকিয়ে গুদামেও রাখা চলে।

সাবধানতাঃ সালফিউরিক এসিড শরীরের চামড়ায় বা কাপড়ে লাগলে তা পুড়ে যাবে। তাই সাবধানে এসিড নিয়ে কাজ করা উচিত।

আলোর উপস্থিতি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বীজের অংকুরোদগমকে ত্বরান্বিত বা প্রতিরোধ করে। এসব ক্ষেত্রে আলো বীজের সুপ্ততা ভংগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

(৪) **আলো ঃ** আলোর উপস্থিতি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বীজের অংকুরোদগমকে ত্বরান্বিত বা প্রতিরোধ করে। এসব ক্ষেত্রে আলো বীজের সুপ্ততা ভংগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। চিহ্নিত আলোর উপস্থিতি বীজের প্রকার, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তার সুপ্তাবস্থাকে ভেংগে দিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। পরিপক্কতা লাভের পরপরই আলোর প্রতি বীজের সংবেদনশীলতা বেশি থাকে এবং গুদামজাত করার বয়সের সাথে তা কমতে থাকে।

(৫) **গুদামজাতকরণ ঃ** অনেক বহুবর্ষজীবী লতাগুল্মের বীজ বেশ কিছুদিন গুদামজাত না করা পর্যন্ত তাদের অংকুরোদগম হয়না। এই সুপ্ততা কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় বীজকে শুকনাবস্থায় বেশ কিছুদিন ঘরে রাখা হয় এবং পরে বপন করার ফলে উক্ত সময়ের মধ্যে বীজের সুপ্ততা প্রাকৃতিকভাবেই ভেংগে যায়।

(৬) **সরাসরি বপন ঃ** অনেক জাতের বীজ, যেমন ঃ জুনিপার ও ম্যাগনোলিয়ার প্রজাতি সমূহে পরিপক্কতা লাভের পর বীজ শুকিয়ে গেলে বীজাবরণ যথেষ্ট শক্ত হয় ও বীজে সুপ্ততা আসে। এ অবস্থায় উক্ত বীজসমূহকে না শুকিয়ে সরাসরি বপন করলেই সুপ্ততার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

(৭) **বীজকে ঠান্ডায় রাখা ঃ** বহু প্রকার বৃক্ষ ও ঝোপ জাতীয় গাছের বীজের সুপ্ততা ভংগের জন্য ঠান্ডা প্রয়োগ ফলপ্রসু হয়েছে। এই ঠান্ডাবেশ বীজে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় যার ফলে বীজের পরবর্তী পরিপক্কতা ত্বরান্বিত হয়। এ পদ্ধতিতে বীজকে ১^{o}–১০^{o} সেঃ তাপমাত্রা, পরিমিত পানি এবং অক্সিজেনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়। প্রথমে বীজকে শুস্ক অবস্থায় ১২–২৪ ঘন্টার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় তারপর আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে এমন মাধ্যমে যেমন ঃ বালি, পিট মাটি, করাতের গুঁড়া ইত্যাদির মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ২^{o}–৭^{o} সেঃ তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে বীজের প্রকৃতির উপর। তবে অধিকাংশ বীজের জন্য ১–৪ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনবোধে উক্ত সময়ে মাঝে মাঝে পানি দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর বীজের সুপ্ততা ভংগ হয় এবং বীজে অংকুরোদগম হতে থাকে। তখনই বীজ বপন করা উচিত।

তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে বীজের সুপ্তাবস্হা পরিবর্তন করা সম্ভব। তাপমাত্রার পরিবর্তন দুইভাবে করা যায়-
ক) শুস্ক অবস্থায় ও
খ) ভিজা অবস্থায়।

(৮) **তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে ঃ** তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে বীজের সুপ্তাবস্হা পরিবর্তন করা সম্ভব। তাপমাত্রার পরিবর্তন দুইভাবে করা যায়ঃ

(ক) শুস্ক অবস্থায় ও

(খ) ভিজা অবস্থায়।

(ক) **শুস্ক অবস্থায় ঃ** এ পদ্ধতিতে বীজে শুস্ক অবস্থায় তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটানো হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের পরিমাণ ১০^{o}–২০^{o} সেঃ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন ঃ জনসন ঘাস এর বীজ ৩০^{o} সেঃ তাপমাত্রায় ১৮–২২ ঘন্টা এবং পরে ৪৫^{o} সেঃ তাপমাত্রায় ২–৮ ঘন্টা রেখে সুপ্ততা ভাংগানো সম্ভব হয়েছে।

(খ) **ভিজা অবস্থায় ঃ** এ পদ্ধতিতে ভিজা অবস্থায় তাপমাত্রার পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনের সীমা অনেক বেশি। প্রথমে শক্ত আবরণ সম্পন্ন বীজকে তাদের প্রায় ৫ গুণ পানিতে ভিজিয়ে ৭৭^{o}–১০০^{o} সেঃ তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ রাখা হয়। তারপর আবার ঠান্ডা পানিতে ১২–২৪ ঘন্টা রাখা হয় এবং তারপর বীজকে সরাসরি বপন করা হয়।

(৯) **চাপ প্রয়োগ ঃ** চাপ প্রয়োগের মাধ্যমেও বীজের সুপ্ততা ভংগ করা যায়। বীজ শুকানোর আগে এই চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং চাপের প্রভাব শুকানোর পর অথবা গুদামজাত করার দরুণ দূরীভূত হয়না।

আলফা আলফা বীজের সুপ্ততা ভংগের জন্য ১৮^{o} সেঃ তাপমাত্রা ও ২০০ বায়ুচাপে বীজকে ৫–১০ মিনিট রেখে দেওয়া বেশ কার্যকরী।

(১০) **রাসায়নিক উত্তেজক প্রয়োগ ঃ** বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক উত্তেজক দ্বারা বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলোঃ

(ক) **পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্বারা ঃ** অনেক সদ্য আহরিত বীজের সুপ্ততা ভংগের জন্য পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে বীজকে চোষ কাগজ বসানো একটি পেট্রিডিসে নিয়ে ০.১ থেকে ০.২% দ্রবণ দ্বারা চোষ কাগজ ভিজিয়ে দেয়া হয়। দ্রবণ শুকিয়ে গেলে আর পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ না দিয়ে শুধু পানি দিতে হয়। এভাবে কিছুক্ষণ রাখার পর বীজের সুপ্ততা ভংগ হয়।

(খ) **সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড ঃ** ধান বীজের খোসায় পানিতে দ্রবণীয় যে অংকুরোদগম নিরোধক থাকে তা দূরীকরণের জন্য উপরোক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। ১০০ গ্যালন পানিতে ১ গ্যালন সোডিয়াম হাইপো ক্লোরাইড (১% দ্রবণ) মিশিয়ে এ কাজ করা হয়।

(গ) **থায়ো ইউরিয়া ঃ** যে সমস্ত বীজ অন্ধকারে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গজায় না, তাদের সুপ্তাবস্হা ভাঙ্গার জন্য থায়ো ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ০.৫—৩% দ্রবণে বীজ ভিজিয়ে রাখতে হয়। তবে ২৪ ঘন্টার বেশি বীজ ভিজিয়ে রাখা যাবে না, কারণ গাছের বৃদ্ধির উপর থায়ো ইউরিয়ার কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে।

(ঘ) **জিবারেলিক এসিড ঃ** বীজের সুপ্তাবস্হাজনিত অসুবিধা দূরীকরণে জিবারেলিক এসিড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি বীজ গজাতে, অংকুরোদগম হার বৃদ্ধি এবং চারা গাছের বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হয়। এমনকি বীজের এপিকোটাইল খাটোজনিত অসুবিধা দূরীকরণের জন্যও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ১০০—৫০০ গ্রাম এসিড ১০০০ মিঃলিঃ পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করা হয়। অনেক সময় শক্ত বীজাবরণ ভেংগে দিতে হয় অথবা খোসা খুলে নিতে হয় যাতে দ্রবণ সহজে প্রবেশ করতে পারে। এসিডের দ্রবণ বীজের বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্হার ওপর নির্ভরশীল।

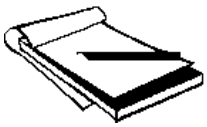

অনুশীলন (Activity) ঃ *বীজের প্রাথমিক সুপ্ততা ভঙ্গের জন্য আপনি কী কী পন্থা অবলম্বন করবেন উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। নিম্নের কোন এসিড দ্রবণ দ্বারা বীজের সুপ্ততা ভংগ করা যায়?
- ক) হাইড্রোক্লোরিড এসিড
- খ) নাইট্রিক এসিড
- গ) সালফিউরিক এসিড
- ঘ) বেনজোয়িক এসিড

২। বীজের সুপ্ততা ভংগের জন্য কোন বীজে ১৮^{0} সেঃ ও ২০০ বায়ু চাপ কার্যকরী হয়েছে?
- ক) আলফা আলফা বীজে
- খ) ধৈঞ্চা বীজে
- গ) ইপিল ইপিল বীজে
- ঘ) ধান, পাট বীজে

৩। কোন কোন রাসায়নিক উত্তেজক দ্বারা বীজের সুপ্ততা ভংগ করা যায়?
- ক) পটাসিয়াম নাইট্রেট, থায়ো ইউরিয়া, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, জিবারেলিক এসিড।
- খ) থায়ো ইউরিয়া, সালফিউরিক এসিড, বেনজোয়িক এসিড, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড।
- গ) বেনজোয়িক এসিড, পটাসিয়াম নাইট্রেট, থায়ো ইউরিয়া ও জিবারেলিক এসিড।
- ঘ) বেনজোয়িক এসিড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, থায়ো ইউরিয়া ও সালফিউরিক এসিড।

৪। ভিজাবস্থায় বীজের সুপ্ততা ভংগের পদ্ধতিতে বীজকে ওজনের কতগুণ পানির সাথে ভিজিয়ে রাখতে হয়?
- ক) ৫ গুণ
- খ) ৩ গুণ
- গ) ২ গুণ
- ঘ) ১০ গুণ

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা

এ অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি –

- বীজের আর্দ্রতা নিরূপণ করার পদ্ধতি আয়ত্ব করতে পারবেন।
- বীজের আর্দ্রতা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি সর্ম্পকে ধারণা লাভ করবেন।

বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা ঃ তাত্ত্বিকভাবে বীজের আর্দ্রতা বলতে বীজের মধ্যে যে মুক্ত পানি আছে তাকেই বুঝায় যা সমস্ত বীজের ওজনের শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে, তবে নিম্নলিখিত দু'টি পদ্ধতিই প্রধানত অনুসরণ করা হয়।

১। ওভেন ড্রাই পদ্ধতি।

২। ময়েশ্চার মিটার পদ্ধতি।

বীজের আর্দ্রতা বলতে বীজের মধ্যে যে মুক্ত পানি আছে তাকেই বুঝায় যা সমস্ত বীজের ওজনের শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়।

ওভেন ড্রাই পদ্ধতি ঃ আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষণ সংস্থায় (ISTA) নিয়মানুযায়ী নিম্নলিখিত দু'টি ওভেন ড্রাই পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজের আর্দ্রতা নির্ণয় করা যেতে পারে-

(ক) অপরিবর্তনীয় নিম্নতাপে (১০৩^{o} সেঃ এ ১৭ ঘন্টা) তৈলসমৃদ্ধ বীজকে শুকানো।

(খ) অপরিবর্তনীয় উচ্চ তাপে (১৩০^{o} সেঃ) ভূট্টা বীজ ৪ ঘন্টা, দানাশস্য বীজ ২ ঘন্টা এবং অন্যান্য বীজ ১ ঘন্টা শুকানো।

পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত বীজ এর কার্য সম্পাদন নমুনা থেকে ৪–৫ গ্রাম ওজনকৃত বীজ নিয়ে (চূর্ন কিংবা অচূর্ন) ওভেনে নির্ধারিত তাপমাত্রায় শুকানো হয়। তার পর ওভেন থেকে বের করে নিয়ে ঠান্ডা করার পর পুণরায় ওজন করা হয়। শুকানোর পূর্বের এবং পরের ওজনের পার্থক্যকে শতকরা হারে প্রকাশ করলেই বীজের আর্দ্রতার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। বীজের আর্দ্রতা নিম্নের সূত্রের সাহায্যে বের করা হয়-

$$\%\text{আদ্রতা} = \frac{\text{ক - খ}}{\text{ক}} \text{ X ১০০}$$

ক = বীজ নমুনার প্রকৃত ওজন (শুকানোর পূর্বে পাত্রসহ বীজের ওজন)

খ = বীজ নমুনাকে শুকানোর পর ওজন (শুকানোর পর পাত্রসহ বীজের ওজন)

ধান, গম, বার্লি, সরগম, বাদাম, ছোলা, শিম, মটরশুটি ইত্যাদির আর্দ্রতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বীজগুলোকে চুর্ন করতে হয়।

ওসাও ইউনিভার্সেল ময়েশ্চার মিটার দ্বারা বর্তমানে বাংলাদেশের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বীজের আর্দ্রতা মাপা হচ্ছে।

ময়েশ্চার মিটার পদ্ধতি ঃ ময়েশ্চার মিটারের সাহায্যে খুব সহজেই এবং অল্প সময়েই বীজের আর্দ্রতা মাপা যায়। ওসাও ইউনিভার্সেল ময়েশ্চার মিটার (OSAW Universal Moisture Meter) দ্বারা বর্তমানে বাংলাদেশের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বীজের আর্দ্রতা মাপা হচ্ছে। এ যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়ঃ

ওসাও ময়েশ্চার মিটার ব্যবহার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

বীজের নাম	নমুনার পরিমাণ	পুরুত্ব (Thickness) ইঞ্চি	মন্তব্য
ধান	ভলিউম-বি	০.৫৫০	–
গম	ভলিউম-এ	০.২৭৫	–
বার্লি	ভলিউম-বি	০.৬২৫	–
ভূট্টা	ঐ	০.৫৭৫	–
সরগম	ঐ	০.৬৭৫	+১%
সরিষা	ভলিউম-সি	০.৪৫০	× ০.৬
বাদাম	২৬ গ্রাম	০.৪৫০	× ০.৫৬
সয়াবীন	ভলিউম-বি	০.৫৭৫	–২.৫%
বাঁধাকপি	ভলিউম-এ	০.২৬০	× ০.৬
ফুলকপি	ভলিউম-এ	০.২৬০	× ০.৬

চিত্র ১১ ঃ OSAW ইউনিভার্সেল ময়েশ্চার মিটার

পরীক্ষার ধাপসমূহ ঃ

- ❑ বীজের নমুনা সংগ্রহ (কার্যকরী নমুনা) করুন।

বীজের নমুনা সংগ্রহের ধাপসমূহ

বীজ লট
↓
প্রাথমিক নমুনা
↓
কম্পোজিট নমুনা (কয়েকটি প্রাথমিক নমুনার মিশ্রণ)
↓
প্রেরিতব্য নমুনা (কম্পোজিট নমুনার অংশ)
↓
কার্যসম্পাদন নমুনা (Working sample)

- ❑ কার্যকরী নমুনা থেকে বিভিন্ন বীজের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ বীজ নিন। যেমনঃ ধানের ক্ষেত্রে ৫০ গ্রাম বীজ।
- ❑ ওসাও মেশিনের মাইক্রোমিটার স্কেল এবং ভার্টিকেল স্কেল উভয়টি ০ (শুন্যতে) মিলিয়ে (Adjustment) রাখুন।
- ❑ উক্ত পরিমাণ বীজ ওসাও মেশিনের টেষ্ট কাপে ভর্তি করে যথাস্হানে রাখুন।
- ❑ তারপর চার্ট অনুযায়ী নির্ধারিত ফসলের বীজের জন্য নির্দিষ্ট পূরুত্বে চাপ প্রয়োগ করুন। যেমনঃ ধান বীজের ক্ষেত্রে ০.৫৫ ইঞ্চি।
- ❑ চাপ প্রয়োগের পর মেশিনের সুইচ ও ডায়াল সুইচ চালু করুন।
- ❑ এখন ক্যালিব্রেশান (Calibration) কাটার রিডিং এবং মেশিনের সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের রিডিং যে অংকে মিলিত (Coincide) হবে, সে স্হানে ডায়ালকে ঘুরিয়ে আনার ফলে তীর চিহ্নিত স্হানে যে রিডিং পাওয়া যাবে, সেই রিডিংই ঐ বীজের আর্দ্রতার পরিমাণ হিসেবে গণ্য করুন।

এটা খুব সহজ এবং দ্রুত পদ্ধতি। এ মেশিন একবার বাস্তবে ব্যবহার করলে পরীক্ষাটি সহজেই করতে পারবেন। পরীক্ষাশেষে যাবতীয় বিবরণ আপনার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৭ বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা

এ অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি –

- বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বীজের বিশুদ্ধতা কীভাবে পরীক্ষা করা হয় তা আয়ত্ব করতে পারবেন।
- বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

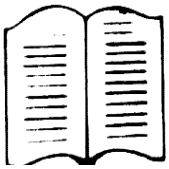

কোন বীজ নমুনায় ওজন ভিত্তিতে শতকরা কত অংশ মূল শস্য বীজ আছে তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা বলে।

বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা ঃ কোন বীজ নমুনায় ওজন ভিত্তিতে শতকরা কত অংশ মূল শস্য বীজ আছে তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা বলে। একটি বীজের নমুনার মধ্যে প্রধানত ৪টি অংশ থাকে যথাঃ

(১) বিশুদ্ধ বীজ
(২) অন্য ফসলের বীজ
(৩) আগাছা বীজ
(৪) জড় পদার্থ

বীজের এই ৪টি ভাগের মধ্যে বিশুদ্ধ বীজের অর্থাৎ মূল শস্য বীজের শতকরা হার কত রয়েছে তা বের করাই হলো বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষণ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ

(ক) পিউরিটি বোর্ড বা বীজ বোর্ড
(খ) মাপক নিক্তি (+০.০০১ গ্রাম)
(গ) ওয়েল পেপার
(ঘ) পেট্রিডিস- মধ্যম ও বড় আকার
(ঙ) চিমটা (Forcep)
(চ) স্ট্যান্ডযুক্ত ম্যাগনেফাইং গ্লাস

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

০ সর্বপ্রথম মাপক নিক্তি দ্বারা কার্য সম্পাদন নমুনার সঠিক ওজন নিন।

০ ওজন নেওয়ার পর সমস্ত বীজ পিউরিটি বোর্ডে ছড়িয়ে দিন। এবারে নমুনাকে নিম্নোক্ত ৪টি অংশে বিভক্ত করতে হবে। বিভক্ত করার জন্য চিমটা ব্যবহার করতে হবে।

(ক) বিশুদ্ধ বীজ
(খ) অন্য ফসলের বীজ
(গ) আগাছা বীজ
(ঘ) জড় পদার্থ।

এসব উপাদান যথাযথভাবে পৃথক করার জন্য এদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য এ পাঠের শেষ দিকের আলোচনা মনোযোগসহকারে পড়ুন।

০ বাছাই করা প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথক পেট্রিডিসে রাখুন। পৃথক করার সময় বীজ শনাক্তকরণের যে কোন সন্দেহের ক্ষেত্রে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করুন।

০ তারপর প্রতিটি অংশের সঠিকভাবে (প্রয়োজনীয় সংখ্যক দশটি ঘর পর্যন্ত) পৃথক ওজন নিয়ে নিম্ন তালিকানুসারে হিসেব নির্ণয় করুন।

০ মনে করি সম্পাদনের নমূনার ওজন G গ্রাম। তখন অন্যান্য ওজন ও বীজের বিশুদ্ধতার সূত্র নিম্নরূপ হবে ঃ

অংশ	ওজন (গ্রাম)	শতকরা হিসেব (দশমিকের পর একঘর পর্যন্ত)
বিশুদ্ধ বীজ	W১	$\frac{W১ \times ১০০}{W}$
অন্য ফসলের বীজ	W২	$\frac{W২ \times ১০০}{W}$
আগাছার বীজ	W৩	$\frac{W৩ \times ১০০}{W}$
জড় পদার্থ	W৪	$\frac{W৪ \times ১০০}{W}$
সর্বমোট	W	১০০%

এখানে উলেখ করা প্রয়োজন যে হিসেব শেষ করার পর যদি কার্য সম্পাদন নমুনা G ও W এর মধ্যে ১% এর বেশি পার্থক্য থাকে তাহলে পুণরায় পরীক্ষা করুন।

এখন আমরা বিশুদ্ধ বীজ, অন্য ফসলের বীজ, আগাছ বীজ ও জড় পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করব।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধ বীজ অংশ শনাক্ত করা যাবে।
(১) সর্ম্পুর্ণ অক্ষত ও সুস্থ বীজ।
(২) ভাংগা বীজের যে অংশে ভ্রূণসহ বা ব্যতীত ৫০% এর বেশি অবশিষ্ট আছে।

০ **বিশুদ্ধ বীজ অংশ ঃ** বিভিন্ন প্রজাতিভেদে বিশুদ্ধ বীজের সংজ্ঞা ভিন্নতর। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধ বীজ অংশ শনাক্ত করা যাবে।

(১) সর্ম্পুর্ণ অক্ষত ও সুস্থ বীজ।

(২) ভাংগা বীজের যে অংশে ভ্রূণসহ বা ব্যতীত ৫০% এর বেশি অবশিষ্ট আছে।

(৩) আংশিকভাবে অপূর্ণ বীজ ও সম্পূর্ণ চিটা বীজ বিশুদ্ধ বীজের অর্ন্তভূক্ত হবে না। এ পরীক্ষার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতে হবে।

০ **অন্য ফসলের বীজ অংশ ঃ** বিবেচ্য ফসলের নির্ধারিত জাত ছাড়া বিবেচ্য ফসলের অন্য প্রজাতির/অন্যান্য সকল জাতের পুষ্ট, আংশিক পুষ্ট ও অর্ধেকের বেশি অংশ সমৃদ্ধ ভাঙ্গণ বীজ।

০ **আগাছা বীজ ঃ** পূর্ণ, অপূর্ণ, ফাটল ধরা বা ভাংগা সকল শনাক্তকৃত আগাছা বীজ এ অংশে অন্তর্ভূক্ত হবে।

০ **জড় পদার্থ ঃ** উপরোল্লিখিত নিয়মে শনাক্তকৃত বিশুদ্ধ বীজ ও অন্য ফসলের বীজ, আগাছা বীজ ব্যতীত অবশিষ্ট অংশটুকু জড় পদার্থ বলে গণ্য হবে। জড় পদার্থ নিম্নরূপ হবেঃ

(১) মূল শস্য বা অন্য শস্য বীজে ৫০% এর কম অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

(২) মূল শস্য বীজের বা অন্য শস্য বীজের বাইরে বা অভ্যন্তরে ছাতাগুটি বা কৃমির গুল উৎপন্ন রয়েছে।

(৩) মূল্য শস্যের বা অন্যান্য শস্যের চিটা অংশ।

(৪) খড়কুটা, পাতা, কান্ড ইত্যাদি।

(৫) মাটি কণা, নুড়ি, ইটের টুকরা, ধুলাবালি, মৃত ও জীবিত কীটপতংগ ইত্যাদি।

নিজহাতে যে কোন বীজের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করার পর তা আপনার নোট বুকে লিপিবদ্ধ করুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৮ বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা কী এবং এ পরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক চারার বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার কৌশল আয়ত্ব করতে পারবেন।

অংকুরোদগম পরীক্ষা ঃ কোন বীজের কোন সুপ্ত ভ্রূণ জাগ্রত হওয়ার নাম অংকুরোদগম। অংকুরিত বীজ সংখ্যা তাত্ত্বিকভাবে শতকরা হারে নির্ণয় করে অংকুরোদগম পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ১০০টি বীজ গজাতে দিলে কতটি বীজ গজিয়েছে বের করলেই বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার শতকরা হার বের হয়ে আসে। অংকুরোদগম ক্ষমতার হার পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করতে হয়।

এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য

(১) বীজ নমুনার স্বাভাবিক চারা উৎপাদনকারী বীজের সংখ্যা (%) নির্ণয়

(২) বীজ নমুনায় অন্যান্য উপকরণ অংশের তুলনায় স্বাভাবিক চারা উৎপাদনকারী বীজের পারস্পরিক পরিমাণ নির্ণয়।

(৩) বপনের জন্য বীজের হার ও বীজের বাজার মূল্য নির্ধারণ।

(৪) বীজের প্রকৃত মান নির্ধারণ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

(১) বীজ অঙ্কুরোদগম যন্ত্র

(২) বোর্ড (সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য)

(৩) মাটি ও বালির বাক্স

(৪) তোয়ালে, চোষ কাগজ, পেট্রিডিস

(৫) নমুনা রাখার ট্রে ইত্যাদি

পরীক্ষা পদ্ধতি

অংকুরোদগমের জন্য কমপক্ষে ৪০০ বীজ নিন এবং পরীক্ষা নির্ভুল হওয়ার জন্য এগুলো চারটি ভাগে (Replicate) ভাগ করুন। প্রতি ভাগে ১০০ টি বীজ থাকবে।

- ❑ বিশুদ্ধ বীজের অংশ থেকে অংকুরোদগমের জন্য বীজ নমুনা নিন।
- ❑ অংকুরোদগমের জন্য কমপক্ষে ৪০০ বীজ নিন এবং পরীক্ষা নির্ভুল হওয়ার জন্য এগুলো চারটি ভাগে (Replicate) ভাগ করুন। প্রতি ভাগে ১০০ টি বীজ থাকবে।
- ❑ সর্ব প্রথম উপযুক্ত পাত্রে যে কোন একটি অংকুরোদগম মাধ্যমের (চোষ কাগজ, ফিল্টার কাগজ, বালি, করাতের গুড়া, তোয়ালে) উপর প্রয়োজনীয় পানি ও বীজ নিন। বীজ স্হাপনের সময় কমপক্ষে বীজের সমান মাপের ১–৫ গুন স্হান ফাঁকা রাখুন।
- ❑ পেট্রিডিস ব্যবহার করা হলে বীজ বসানোর প্রথম দিন পেট্রিডিসটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন। এতে পানির বাষপায়ন কম হয়। তারপর পেট্রিডিস গুলো উপযুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে রেখে দিন। সুবিধা থাকলে পেট্রিডিসগুলো নিয়ন্ত্রিত অঙ্কুরোদগম যন্ত্রে রাখুন।
  - (ক) এখন পেট্রিডিসে নেওয়া বীজের নাম, জাত, সংখ্যা ও পরীক্ষায় বসানোর তারিখ কাগজে লিখে রাখুন।
  - (খ) প্রতিদিন লক্ষ রাখুন যেন পানি শুকিয়ে না যায়। পানি শুকিয়ে গেলেই পুণরায় পেট্রিডিসে পানি দিন। অতিরিক্ত পানি ক্ষতিকর।

(গ) পূর্ব নির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট দিনে অংকুরিত বীজের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ণয় করুন।

(ঘ) অংকুরিত বীজের সংখ্যা নির্ণয়ে কেবল স্বাভাবিক চারার সংখ্যা হিসেব করুন।

$$\text{হিসাব নির্ণয় ঃ অঙ্কুরোদগম \%} = \frac{\text{স্বাভাবিক চারা উৎপাদনকারী বীজের সংখ্যা}}{\text{অংকুরোদগমের জন্য বসানো বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$$

পরীক্ষার ৪টি ভাগের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হলে পুণরায় পরীক্ষা সম্পাদন করতে হবে।

যে বীজগুলোকে অংকুরোদগম পরীক্ষার জন্য বসানো হবে, অংকুরিত হওয়ার পর সেগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয় যেমন ঃ

(১) স্বাভাবিক বীজ অর্থাৎ যেগুলো স্বাভাবিক চারার জন্ম দেয়।

(২) অস্বাভাবিক বীজ অর্থাৎ যেগুলো অস্বাভাবিক চারার জন্ম দেয়।

(৩) মৃত বীজ অর্থাৎ একেবারেই গজায় না।

(৪) সজীব বীজ অর্থাৎ সুপ্তাবস্হা ভাংগার পর অংকুরোদগম হতে পারে।

(৫) শক্ত বীজ অর্থাৎ সুপ্তাবস্হা ভাংগার পরও অংকুরোদগম হতে নাও পারে।

(মালভেসী ও লিগুমিনোসি পরিবারের কোন কোন বীজে শক্ত বীজের উপস্হিতি দেখা যায়।)

প্রথম গণনার সময় স্বাভাবিক বীজগুলো (যা গজিয়েছে) গণনা করে এবং মৃত বীজগুলো (যদি চিহ্নিত করা যায়) ফেলে দিতে হয়। প্রাথমিক গণনার ফলাফল কাগজে/রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এরপর দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত গণনা খুব সতর্কতার সাথে করতে হয়। এ সময় যদি সুপ্ত বীজের উপস্হিতি টের পাওয়া যায় তবে চূড়ান্ত গণনার তারিখ আরও ৫ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। বীজের সুপ্তকাল ভাংগার পরও (পটাশিয়াম নাইট্রেট অথবা জিবারেলিক এসিড প্রয়োগ করে) যদি কোন বীজ না গজায়, তবে সে বীজ মৃত/শক্ত বীজ বলে ধরে নিতে হবে।

স্বাভাবিক চারার বৈশিষ্ট্য ঃ স্বাভাবিক চারার বৈশিষ্ট্য সকল বীজের ক্ষেত্রে এক নয়। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকলে মোটামুটিভাবে চারাকে স্বাভাবিক চারা বলা যেতে পারে।

(ক) সুস্হ ও বর্ধিষ্ণু চারা হলে।

(খ) চারার শিকড় সুউন্নত হলে।

(গ) ইপিকোটাইল ও হাইপোকোটাইল অক্ষত থাকলে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(ঘ) গ্রামিনি পরিবারের চারার ক্ষেত্রে কলিওপটাইল ও প্রাথমিক পাতা সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে (যেমন ঃ গম)।

চিত্র ১২ ঃ গমের স্বাভাবিক চারা

(ঙ) একবীজ পত্রী বীজের জন্য একটি বীজপত্র এবং দ্বিবীজপত্রী বীজের ২টি বীজপত্র থাকলে।

(চ) চারার বৃদ্ধি সুষম থাকলে।

(ছ) চারার সীমিতস্থানে ক্ষত রয়েছে, তবে কোন পরিবহণকারী কোষ কলা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে থাকলে।

ইপিজিয়েল অংকুরোদগমের ক্ষেত্রে শিকড় ও হাইপোকোটাইলের যুক্ত দৈর্ঘ্য বীজের দৈর্ঘ্যের ৪ গুণের বেশি হয়ে গাছের কান্ড, পাতা ও শিকড় সুষমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে।

(জ) চারা সুস্থ থাকলে, দ্বিবীজপত্রী বীজের একটি বীজপত্র বর্তমান থাকলে (বীজপত্রের সংযোগস্থল অক্ষত থাকা সাপেক্ষে)।

(ঝ) ইপিজিয়েল অংকুরোদগমের ক্ষেত্রে শিকড় ও হাইপোকোটাইলের যুক্ত দৈর্ঘ্য বীজের দৈর্ঘ্যের ৪ গুণের বেশি হয়ে গাছের কান্ড, পাতা ও শিকড় সুষমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে।

অস্বাভাবিক চারার বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বীজপত্র না থাকলে এবং গাছের কান্ড, পাতা ও শিকড়ে বিস্তৃত ক্ষত সৃষ্টি হলে।

(খ) কান্ড, পাতা ও শিকড়ের বৃদ্ধি অসম হলে।

চিত্র ১৩ ঃ গমের অস্বাভাবিক চারা

(গ) বেঁকে যাওয়া ও বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া প্লুমিউল বা হাইপোকোটাইল বা এপিকোটাইল সম্পন্ন চারা হলে।

(ঘ) কান্ড, পাতা, শিকড় রোগাক্রান্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত চারা।

চিত্র ১৪ ঃ মটরশুটির স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক চারা (১. স্বাভাবিক চারা, ২–৬. অস্বাভাবিক চারা)

১। স্বাভাবিক চারা (এপিকোটাইল ও রেডিকল এর বৃদ্ধি ভাল)
২। অস্বাভাবিক চারা (দুর্বল রেডিকল)
৩। অস্বাভাবিক চারা (রেডিকল বৃদ্ধি খুব খারাপ)
৪। অস্বাভাবিক চারা (স্ফীত এপিকোটাইল)
৫। অস্বাভাবিক চারা (খুব দুর্বল এপিকোটাইল ও রেডিকল)
৬। অস্বাভাবিক চারা (এপিকোটাইল অনুপস্থিত)

অংকুরোদগম পরীক্ষার ধাপসমূহ ঃ

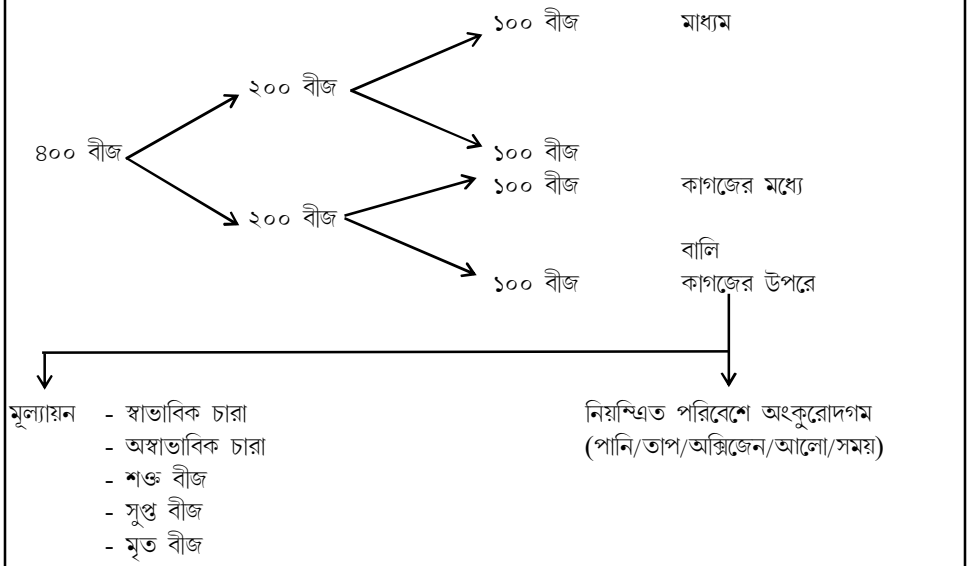

স্বাভাবিক চারা % = অংকুরোদগমের শতকরা হার।

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য

বীজের নাম	মাধ্যম	তাপ (^{o}সেঃ)	পরীক্ষা বসানোর পর হিসাব নেওয়ার দিন	
			প্রথম	চূড়ান্ত
ধান	কাগজ-১, কাগজ-২	২০–৩০; ২৫	৫	১৪
গম	ঐ	২০	৪	৮
ভুট্টা	কাগজ-১, বালি	২০–৩০,২৫,২০	৪	৭
সরগম	ঐ	২০–৩০	৪	১০
যব	ঐ	২০	৫	১০
বার্লি	ঐ	২০	৪	৭
সীম	ঐ	২০–৩০,২৫	৪	১০
গোমটর	ঐ	২০–৩০,২৫	৫	৮
মসুর	ঐ	২০	৫	১০
সয়াবীন	ঐ	২০–৩০,২৫	৫	৭
চীনাবাদাম	ঐ	২০–৩০,২৫	৫	১০

বীজের নাম	মাধ্যম	তাপ (^{o}সেঃ)	পরীক্ষা বসানোর পর হিসাব নেওয়ার দিন	
			প্রথম	চূড়ান্ত
সরিষা	কাগজ-২	২০–৩০,২০	৫	৭
পাট	কাগজ-১, কাগজ-২	৩০	৩	৫
পিয়াজ	ঐ	১৫,২০	৬	১২
বাঁধাকপি	কাগজ-২	২০–৩০,২০	৫	১০
ফুলকপি	কাগজ-২	২০–৩০,২০	৫	১০
টমেটো	কাগজ-১, কাগজ-২	২০–৩০	৫	১৪
মূলা	কাগজ-১, কাগজ-২	২০–৩০,২০	৪	১০
শশা	কাগজ-১, কাগজ-২ বালি	২০–৩০,২৫	৪	৮
বেগুন	কাগজ-১, কাগজ-২	২০–৩০	৭	১৪

কাগজ-১ = কাগজের মধ্যে
কাগজ-২ = কাগজের উপরে

অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার পর তা আপনার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৯ বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারবেন অর্থাৎ কোন রোগ জীবাণু দ্বারা বীজ আক্রান্ত কি না এ পরীক্ষার মাধ্যমে তা নির্ণয় করতে পারবেন।

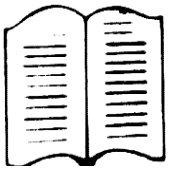

বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) **অল্টারনেরিয়া পদ্ধতি ঃ** সরিষা পরিবারের সবজি ও তৈলবীজ অল্টারনেরিয়া গোত্রের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। বীজে ২, ৪ ডাইক্লোরো ফেনোক্সি এসিটিক এসিডে ০.২% সোডিয়াম প্রয়োগ করে ১৮–২২^{0} সেঃ তাপমাত্রায় ৬–১১ দিন রাখার পর অণুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় উল্লেখিত রোগ জীবাণুর উপস্থিতি জানা যায়।

(খ) **ভাইরাস পরীক্ষা ঃ** সরাসরি বীজে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায় না, তাই বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে ভাইরাসের আক্রমণ যাচাই করে বীজে ভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তাছাড়া বীজ গুঁড়ো করে তার নির্যাস নির্দিষ্ট গাছে প্রয়োগ করে রোগাক্রমণ হয় কী না তা প্রত্যক্ষ করেও বীজে ভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

সুস্থ বীজে সবল চারা উৎপাদন করা সম্ভব। রোগাক্রান্ত বীজ দ্বারা চারা উৎপাদন করা গেলেও পরবর্তীতে উৎপন্ন চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে।

আপনার টিউটোরিয়েল কেন্দ্রে টিউটরের সহযোগিতায় বীজের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুশীলন করতে পারবেন। তবে বাহ্যিকভাবে ও বীজের গায়ে বিভিন্ন রোগ পোকার আক্রমণের চিহ্ন কিংবা বীজের বর্ণের উজ্জ্বলতার তারতম্য দেখেও বীজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা সম্ভব। সুস্থ বীজে সবল চারা উৎপাদন করা সম্ভব। রোগাক্রান্ত বীজ দ্বারা চারা উৎপাদন করা গেলেও পরবর্তীতে উৎপন্ন চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে।

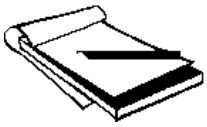

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রকৃত বীজ ও কৃষি বীজের সংজ্ঞা কী?

২। প্রকৃত বীজ ও কৃষি বীজের প্রধান প্রধান পার্থক্য বর্ণনা করুন।

৩। বীজের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। বীজ যে একটা দেশের অর্থনীতিতে ও খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৪। বীজের আকার, আকৃতি, ব্যবহার ও শরীরবৃত্তীয় গুনাবলীর উপর ভিত্তি করে বীজের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস করুন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ২টি করে উদাহরণ দিন।

৫। আন্তর্জাতিক শস্য উন্নয়ন সমিতি (ICIA) কিসের উপর ভিত্তি করে বীজের শ্রেণীবিভাগ করছেন। এবং বিভাগ গুলো কী কী?

৬। বাংলাদেশের বীজ বিধি ধারা মোতাবেক বীজ কত প্রকার ও কী কী? প্রজনন বীজ, ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজের উৎস সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিন।

৭। অঙ্গজ কৃষি বীজের শ্রেণীগুলো প্রত্যেকটির ১টি উদাহরণসহ লিখুন।

৮। একটি বীজ প্রধানতঃ কী কী অংশ দ্বারা গঠিত? প্রত্যেক অংকের বর্ণনা দিন। বীজত্বক ও বীজপত্রের কাজ লিপিবদ্ধ করুন।

৯। ভালোবীজের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন ।

১০। ভালোবীজের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধানতঃ কয়েকটি গুনে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি গুণাগুণের বিশদ বর্ণনা দিন।

১১। বীজের সুপ্ততা কাকে বলে? বীজের সুপ্তাবস্হা কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটির বর্ণনা দিন।

১২। প্রাথমিক সুপ্ততার কারণগুলো কী কী? প্রত্যেকটি কারণ এর বর্ণনা দিন।

১৩। মাধ্যমিক সুপ্ততার কারণগুলো কী কী? কারণগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

১৪। ভৌতিক ও রাসায়নিক উপায় অবলম্বন করে কী ভাবে বীজের সুপ্ততা ভংগ করা যায় তা বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ - ১.১

১. খ ২. গ ৩. ক

পাঠ - ১.২

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. খ

পাঠ - ১.৩

১. খ ২. খ ৩. গ ৪. গ

পাঠ - ১.৪

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ

পাঠ - ১.৫

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ক